গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার সম্প্রতিকার গল্পগুলি একত্র প্রকাশিত হইল। অনেক গল্পের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রঙিন কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

তিন চারটি গল্পের প্লট বিদেশী গল্পের ভাব আশ্রয় করিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদেরও কেন্দ্রগত আসল ভাবটি আমারই নিজস্ব, বিদেশী গল্পগুলি আমার কল্পনার অঙ্কুরকে পল্লবিত করিয়াছে মাত্র।

কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩১৮

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

পুষ্পপাত্র ॥৵০

ছোট গল্পের বই। বাঁধানো।

কাদম্বরী ॥৵০

কাদম্বরীর উপাখ্যান পণ্ডিত তারাশঙ্কর বাংলায় লিখিয়াছিলেন। তাহার বাহুল্য ও অশ্লীল অংশ বর্জ্জন ও তাহাতে মূলের বর্ণ-চিত্র-গুলি সংযোজন করিয়া সম্পাদিত। সটীক ও সচিত্র। কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত।

পারস্যোপন্যাস ৸০

অশ্লীল অংশ ... বর্জ্জন করিয়া ও ভাষা মার্জ্জিত করিয়া সম্পাদিত। সচিত্র ও বাঁধানো।

রবিন্সন ক্রুসো ১।০

ইংরাজি সমগ্র গ্রন্থের সরস অনুবাদ। সচিত্র ও বাঁধানো।

মহাভারত ৩৲

কাশীরাম দাসের অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত অশ্লীল অংশ বর্জ্জন বা সংশোধন করিয়া সম্পাদিত। সটীক ও সচিত্র এবং বাঁধানো।

বিষ্ণুপুরাণ ॥৵০

বিষ্ণুপুরাণের সুন্দর গল্পগুলি নিজের ভাষায় লিখিত। সচিত্র।

সূচী

একটি মেহেদির পাতা

১

গুজরাতের নবাব-দরবারে মাধব মিশ্র সভা-কবি। আর জেব-উন্নিসা নবাবজাদী।

কবি থাকেন দরবারে, শাহজাদী থাকেন অন্দরে। শ্বেত-পাথরের জালিকাটা পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া বসিয়া শাহজাদী শুনেন কবির কাব্য, আর আম দরবারে কাব্যছন্দের যতিতালে কবি শুনেন নাজানি কাহার ভূষণশিঞ্জন।

কবি শাহজাদীকে চক্ষে দেখেন নাই; কখনো শুধু শাহজাদীর সবুজ ওড়নার ক্ষীণ ছায়াটুকু শ্বেত পাথরের স্বচ্ছ জালির ভিতর দিয়া একটু ক্ষীণ হাসির আভাসের মতো উঁকি মারিয়া যায়; কখনো বা লাল পেশোয়াজের শোণিতবরণ আভাটুকু কাবরংচোখে মদের নেশাটুকুর মতো জড়াইয়া ধরে।

কবির এইটুকু সম্বল, কবির সহিত অলক্ষিতার এতটুকু পরিচয়। কিন্তু কল্পনাকুশল কবি এই ছায়াটুকুকে যখন মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তুলিয়া কোন এক অনির্দ্দিষ্ট মানসী সুন্দরীর বন্দনাগীত গাহিতেন তখন মর্ম্মর-জালায়নের অন্তরালে কাহার জরিজড়াও কিংখাবের পোষাক নিজের অন্তরালে একখানি ব্যথিত হৃদয়ের চঞ্চলতার

আভাস কবির কানে গুঞ্জন করিত, তাহার ভূষণশিঞ্জন কবির প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিত।

কবিও অমনি সেই অদৃষ্ট সুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতেন— সেই ত সুন্দরী যাহার তনুলতা আলিঙ্গন করিয়া জরিজড়াও কিংখাব ধন্য হইয়াছে। সোনালি পাতে মোড়া ছাঁচি পানের খিলির মতো যাহার অন্তরের মধ্যে শুধু রসধারা, যাহার উপরের সোনালি আবরণ অন্তরের প্রণয়রসকে লোকচক্ষু হইতে অন্তরাল করিয়া রাখে, সেই রূপসীর রসরূপ যে না চিনিয়াছে সে যে বঞ্চিত। অয়ি বিভূষণী, আমার এই বন্দনাগীতি তোমারই ভূষণদ্যুতিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলুক!

শাহজাদী কবির গান শুনিয়া শুনিয়া মনে মনে বলিতেন—ঠিক বলিয়াছ কবি, আমি সোনালি পাতে মোড়া ছাঁচি পান, আমার বাহিরে সোনা—চকচকে ঝকঝকে, অন্তরে নিরাশার শোণিত-রস!

ভাবিতে ভাবিতে শাহজাদী শ্বেত পদ্মদলে ভ্রমরের মতো, শ্বেত পাথরের জালির ফাঁকে কালো কালো টানা টানা সুর্মা-আঁকা চোখদুটি রাখিয়া বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিতেন সুগৌর সুন্দর কবি—তাঁহার হস্ত দুটি লীলায়িত করিয়া বিবিধ ছন্দে কত বিচিত্র গাথা আবৃত্তি করিতেছেন; সে স্বরে কি মাধুর্য্য, কি তেজ! সে মুখে কি কোমলকান্ত উজ্জ্বলতা!

দেখিতে দেখিতে বাদশাজাদী গুলাবভরা রুমাল তুলিয়া চোখ মুছিতেন, গোলাপের প্রাণ-চুরানো মিঠা গন্ধে দরবারখানি ভরিয়া উঠিত, কবির প্রাণে মদির আবেশ স্পর্শ করিত। উতলা কবির চেতনা শিথিল হইয়া পড়িত, ছন্দ শ্লথ হইয়া আসিত, বাক্য গদগদ

হইত, আর সভাসুদ্ধ লোক বাহবা বাহবা করিয়া তারিফ করিত।

সে তারিফ কবির কানে পৌঁছিত কিনা কে জানে, কিন্তু শ্বেত পাথরের জালির আড়ালে বাদশাজাদীর সমস্ত অন্তর সেই প্রশংসায় নাচিয়া উঠিত।

২

এমনি করিয়া দিন যায় দিন আসে। নবাব দরবার রাজনীতির পাকচক্র হইতে দিনের মধ্যে একবারের জন্য আপনাকে মুক্ত করিয়া কাব্যকথায় আত্মহারা হয়। কিন্তু কোথায় কোন্ হৃদয়তলে গোপনে কি দুঃখ ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহার খবর আনন্দবিহ্বল রাজসভা কিছুই রাখিত না।

আর কবি? তিনি নিজের তরল কল্পনায় যে অলক্ষিতায় অভিষেক করিতেছিলেন, খেলার ছলে যাহার রূপবহ্নিকে ঘিরিয়া তাঁহার কবিত্বের আহুতি ঢালিতেছিলেন, সে যে ভাবাবেশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিল এ খবর ভাবভোলা কবিও রাখিতেন না। তিনি তাঁহার অন্তরের সমস্ত কবিত্বরসধারা একজনকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া নিজেরই মানসীর চরণবন্দনা করিতেছিলেন; কিন্তু তাহা যে নিজের বলিয়া ভুল করিয়া অপরে কুড়াইয়া কুড়াইয়া অন্তর-নিভৃতে সঞ্চিত করিতেছিল সে খবর কবি জানিতেন না।

একদিন কবি নিজের কুঞ্জঘেরা কুটীরখানিতে বসিয়া নূতন গান রচনা করিতেছেন, এমন সময় বাদশাজাদীর খাস বাঁদি দরিয়া বিবি কবির সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে সমস্ত দেহখানি লীলায়িত করিয়া সেলাম করিল।

কবি বলিলেন, "কি দরিয়া বিবি, এ গরিবখানায় তসরিফ আনিয়াছ কি মনে করিয়া ?"

"খবর আছে কবি খবর আছে" বলিয়া দরিয়া বিবি সমস্ত দেহ-খানি বেতসলতার মতো দুলাইয়া কবির সম্মুখে তাহার করপুট প্রসারিত করিয়া ধরিল।

তাহার হাতের উপর জরিজড়াও কিংখাবের রুমাল ঢাকা কি ?

কবি রুমাল খুলিয়া দেখিলেন একখানি সোনার রেকাবে সোনালি তবক মোড়া একখিলি ছাঁচি পান।

দরিয়া হাসিয়া বলিল "কবিকে বাদশাজাদীর নজর !"

বিহ্বল কবি সব বুঝিলেন। তিনি যে খেলা করিবার ছলে একজনের ঘরে আগুন দিয়া নিজের পথ আলো করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বিষণ্ণ ব্যথিত কবি বলিলেন, "দেখ দরিয়া, আমি বাদশাজাদীর দাস—আমি তাঁহার গুণগান করিয়াছি, রূপের প্রশংসা করিয়াছি, আমি তাহাতেই আনন্দ পাইয়াছি, আর কিছু চাহি নাই। বাদশা-জাদী আমাকে প্রণয় দিয়া বরণ করিবেন তার উপযুক্ত আমি নই।"

প্রত্যাখ্যান-ব্যথিতা দরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কবির রচনায় রস দানা বাঁধিল না।

৩

পরদিন দরবার-শেষে কবি কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, নব নব গানে সভাগৃহ ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন না।

নবাব বলিলেন "কি কবি ? তোমার আর্জি কি ?"

কবি মস্তক নত করিয়া নবাবের সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন "জাঁহাপনা, আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই।"

"কবি, এমন অসময়ে ছুটির আর্জি কেন? বসন্তকাল সমাগতপ্রায়, কাব্যরসে তুমি দরবার মাতাইয়া তুলিবে, না, এখন তোমার ছুটির আর্জি? একি কবি, ব্যাপার কি?"

"হুজুর, আমার রসের পুঁজি ধার-করা। এখন একটা নিজস্ব ভাণ্ডার না হইলে চলিতেছে না। আমি তাই বিবাহ করিব।"

বাদশাহের মুখ কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সমস্ত সভার সকৌতুক দৃষ্টি লজ্জাবিনম্র তরুণ কবিকে অভিনন্দন করিল। বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন "কে সে ভাগ্যবতী, যে নবাব দরবারের খাস কবির রসের রসদ জোগাইবে? কে সে কবি, কে সে?" সমস্ত দরবার রুদ্ধ নিশ্বাসে উন্মুখ প্রতীক্ষায় কবির মুখের পানে চাহিল। শ্বেতপাথরের জালির ফাঁকে কস্তুরীবাসিত কাহার নিশ্বাস আকুল প্রতীক্ষায় আশা আশঙ্কায় বড় ঘন ঘন কবির কানে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। কবি বাদশাহকে কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, সে আমারই উপযুক্ত, দরিদ্রা পল্লীকন্যা। এর বেশি তার পরিচয় দিবার কিছু নাই।" বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন, "সাবাস কবি! অন্তরের পরিপূর্ণতা তোমাদের বাহিরের রিক্ততা ভরিয়া তুলুক! আজিকার খবর বড় খুসির খবর, কবি!" দরবার আনন্দ পুলকে চঞ্চল মুখর হইয়া কবিকে অভিনন্দন করিল। কেবল শ্বেতপাথরের জালির আড়াল হইতে কোন্ রূপসীর ব্যথিত চিত্তের দীর্ঘনিশ্বাস কবির কানে সূচীর মতো আঘাত করিয়া গেল কে জানে?

কবি অনুভব করিতেছিলেন কাহার দুটি কালো চোখ ব্যথিত

প্রাণের বেদনা বহিয়া তাঁহারই পৃষ্ঠে করুণ কাতর দৃষ্টি হানিতেছে; কাহার জাফরানরাঙা ঠোঁটদুখানি ব্যথিত অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; কাহার ক্ষুব্ধ হৃদয় কাঁচুলির কঠিন কারা ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে; কাহার মেহেদিমাখা হাত দুখানি দুঃসহ বেদনাভরে নির্ভরে নিপীড়িত হইতেছে!

কবি অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছিলেন, আপনাকে লুকাইতে চাহিতেছিলেন। বাদশাহ কবির ছুটি মঞ্জুর করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন; কবি মুক্তি পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু অন্দর-মহলে কাহার পায়ের পাঁয়জেব গুঞ্জরি মর্ম্মবেদনায় গুমরিয়া গুমরিয়া পরিণয়-উৎসুক কবির কানে কি কথা গুঞ্জরিয়া গেল।

কবি গৃহে আসিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় বাদশাজাদীর খাস বাঁদি দরিয়া বিবি আসিয়া হাজির। দরিয়া কবিকে নীরবে গম্ভীরভাবে সেলাম করিল।

বাদশাজাদীর বাঁদিকে দেখিয়া কবির মুখ শুকাইয়া গেল, অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কবি আপনার বেদনাটিকে লঘু ও তুচ্ছ করিয়া ফেলিবার জন্য সকল হৃদয়ের চেষ্টায় শুষ্ক কাতর অন্তরটিকে নিপীড়ন করিয়া একবিন্দু রহস্যরসে আপনার বাক্যগুলি পরিসিক্ত করিয়া বলিলেন "কি দরিয়া বিবি, অসময়ে কূল ছাপাইয়া দরিদ্রের কুটীরে আজ আবার কোন আনন্দপ্লাবন বহন করিয়া আনিয়াছ?"

দরিয়া আজ বড় গম্ভীর, সে উদাসভাবে বলিল "আনন্দপ্লাবন নয় মিশিরজী! হৃদয়-ভাঙা শোণিতরাঙা খুনের খবর এনেছি!"

দরিয়া তাহার হাত দুখানি প্রসারিত করিয়া ধরিল।

তাহার করপুটের উপর লাল রঙের রুমাল ঢাকা আজ আবার কি ?

দেখিতে কবির কৌতূহল হইল না, রুমাল তুলিতে হাত সরিল না, কবি নিস্পন্দ নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া।

দরিয়া নিজেই রুমাল সরাইয়া ফেলিল।

কবি দেখিলেন—একখানি মাটির সরায় সোনার তবক মোড়া ছাঁচিপান—ছেঁচা,—তাহার অন্তর কাটিয়া শোণিতধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

কবি অশ্রু মুছিতে মুছিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কবি বিবাহ করিয়া ফিরিয়াছেন।

নবাব বলিলেন "কবি, আজ তোমার নূতন ছন্দে নূতন রসের নূতন গান শুনাও।"

কবি গাহিতে লাগিলেন—সেই ত রূপ যা প্রসাধনের অপেক্ষা রাখে না, যা স্বভাবসুন্দর। কমলিনীকে মোতিবোনা সোনার কাপড় পরাইতে হয় না, সামান্য শৈবালেও তাহার রমণীয়তা বৃদ্ধি পায়। ভূষণ রূপকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে, বাহুল্য সৌন্দর্য্যকে আড়ষ্ট করিয়া তুলে।

এইদিন হইতে গান করিতে করিতে কবির মনের মাঝে একটি ভূষণরিক্ত অনিন্দ্য হাস্যমণ্ডিত মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিত, কবি ভাবে তন্ময় হইয়া গাহিতেন। আরাধ্যকে পূজা করিয়া ভক্তের যে আনন্দ তাহাতেই কবি বিহ্বল আত্মহারা হইতেন ; তাঁহার গানে বিলাসের চটুলতা, ঐশ্বর্য্যের আবিলতা নাই, তাহা তাপসকন্যার মতো রিক্ত শুদ্ধ শুচি।

কবি এই এক অনাস্বাদিত নূতন আনন্দে টল টল করিতেন, কোথায় কাহার মনে ব্যথা বাজিত, কাহার মনে তাঁহার পূর্ব্বের গানের সহিত বর্ত্তমানের গান তুলনায় বি-সম বোধ হইত, তাহার খবর কবি আর রাখিতেন না।

আর বাদশাজাদী? কবির নূতন গান শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার অঙ্গের আভরণগুলি তাঁহাকে লজ্জা দিত, ধিক্কার দিত। তিনি সেই অভূষণা অপরিচিতার অভিনব মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। আজন্ম বিলাসপ্রাচুর্য্যে পালিতা বাদশাজাদী ঠিক বুঝিতে পারিতেন না ভূষণ বিনা সৌন্দর্য্য; সে না জানি কিরূপ, যাহার প্রশংসায় কবি আজ আত্মহারা! সেই সৌভাগ্যবতী কেমন না জানি, যাহার রিক্ত সৌন্দর্য্যে কবি-হৃদয় মুগ্ধ! বাদশাজাদীর ঐশ্বর্য্য যে হৃদয় জয় করিতে গিয়া অপমানে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই হৃদয় যে বিনা পণে জয় করিয়াছে, সে না জানি কেমন! কেমন কুহকিনী, কেমন বিজয়িনী সে! বাদশাজাদীর সকল জহরাত দিয়া একটি পল্লীকন্যার সহিত যদি ভাগ্যবিনিময় হইতে পারিত!

৫

বসন্তকাল। নবীন ঐশ্বর্য্যে প্রকৃতির রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ। গাছে গাছে কচিপাতা, পুষ্পমুকুল, পাখীর গান। বসন্তের মোহন স্পর্শের যে আনন্দ কাঠ ভেদ করিয়া পেলবস্পর্শ পত্রেপুষ্পে আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে, তাহা মানুষের প্রাণকে একেবারে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। দেশময় নরনারী বাৎসরিক বনভোজনের উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। তরুণ তরুণীর কলহাস্তে

আমলকীবন মুখরিত; সথাসখীর মিলনানন্দে আমলকীকুঞ্জ পুলকিত!

কবিপ্রিয়া সদ্যবিবাহের উচ্ছল আনন্দে বনভোজনের উৎসবটিকে সকল প্রাণ দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

একদিন অকস্মাৎ তাহার নিকট আসিল বাদশাজাদীর মোহর-মারা জাফরানরঙা এক পত্র।

ভয়ে ভয়ে শোণিতবরণ গালার মোহর ভাঙিয়া খামের হৃদয় চিরিয়া কবিপ্রিয়া পড়িল বাদশাজাদীর রহস্যভরা ছোট চিঠি—

"পরম সৌভাগ্যবতী ভগিনি, তোমাদের বাৎসরিক বনভোজন-উৎসবে আমার নিমন্ত্রণ তোমার কাছে।—ইতি হতভাগিনী জেবউন্নিসা।"

একি এ রহস্য! বাদশাজাদী যাচিয়া নিমন্ত্রণ লইতেছেন সামান্য পল্লীললনার কাছে! কবিপ্রিয়া হাসিয়া আকুল। কিন্তু কবি হইয়া গেলেন ম্লান বিষণ্ণ।

আমলকীবনে বাদশাজাদী আজ কবিপ্রিয়ার অতিথি।

কবিপ্রিয়া কোমরে ওড়না জড়াইয়া অতিথি-পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। স্বহস্তে বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে। আর বাদশাজাদী দূরে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহার লীলাভঙ্গী দেখিতেছেন। সমস্ত দিন বৃষ্টির পরে দিনান্তের রৌদ্রটুকুর মতো নবাবজাদীর হাসি, সে হাসির তুলনায় কবিপ্রিয়ার প্রাণভরা উচ্ছ্বসিত উল্লাস প্রভাত-রৌদ্রের মতো জল জল করিতেছিল। বাদশাজাদীর দৃষ্টি হইতে একটি গভীর বেদনাভরা প্রীতি কবিপ্রিয়ার প্রত্যেক কর্ম্মকে অভিনন্দন করিতেছিল।

বেলা হইল। আমলকীর ঝালরকাটা পাতার ফাঁকে ফাঁকে

চেয়া চেয়া রৌদ্রছায়া খেলা করিতেছিল। তুলির মতো আমলকীর ফুলগুলি রৌদ্রতাপে কোমল শিথিল হইয়া স্নিগ্ধ ঘ্রাণের নিশ্বাস ফেলিতেছিল। বড় বড় মুক্তার মতো আমলকীর ফলগুলিতে রৌদ্র লাগিয়া লাবণ্য উছলিয়া পড়িতেছিল।

জেবউন্নিসা দেখিয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে এক একবার বলিতেছিলেন "বহিন; ঢের রান্না হইয়াছে, আমি একদিনে আর কত খাইব? চল আমরা স্নান করিয়া আসি।"

একথার উত্তরে কবিপ্রিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষ হানিয়া শুধু একটু একটু হাসিতেছিল।

বাদশাজাদী মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "বহিন, রান্না ছাড়, নহিলে আমি সব ছুঁইয়া দিব।"

কবিপ্রিয়া হাসিয়া রন্ধন সমাপ্ত করিল।

বাদশাজাদী কবিপ্রিয়ার সঙ্গে বাউলিতে স্নান করিতে গিয়াছেন। দীর্ঘ সোপানে পা ফেলিয়া ফেলিয়া লীলাঞ্চিত গতিতে উভয়ে গভীর কূপের তলে নামিয়া গেল। কবিপ্রিয়া আপনার পরিচ্ছদ খুলিয়া সোপানে রাখিল, বাদশাজাদীও দেখাদেখি আপনার মণিমাণিক্যে খচিত জরিজড়াও খুলিয়া খুলিয়া সোপানে রাখিলেন। তারপর উভয়ে জলে নামিয়া গল্পে হাস্যে পরিহাসে তন্ময় হইয়া অবগাহন করিতে লাগিল।

বাদশাজাদী হঠাৎ জল ছাড়িয়া কবিপ্রিয়ার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ পরিতে লাগিলেন। বিস্মিতা কবিপ্রিয়া বলিল "ওকি বহিন, আমার কাপড় পর কেন?"

বাদশাজাদী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "একদিন ছিল, তোমার কবি আমার জরিজড়াওয়ের গুণগান করিতেন। এখন

শুনি তোমার এই সাদা পোষাকের স্তুতি! তাই বহিনু, একবার পরিয়া দেখি।”

কবিপ্রিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল “বহিন, তুমি বাদশাজাদী, তাতে তোমার দুঃখ কি?”

বাদশাজাদী হাসিয়া বলিলেন—

“দর্ নিহাঁ খুনম্, জাহির্ গর্‌চে রঙ্গ-ই-নাজুকম্।
রঙ্গ-ই-মন্ দর মন্ নিহাঁ, চুঁ রঙ্গ-ই-সুব্‌খ্ আন্দর্ হেনাস্ত্॥

ওগো যেজন মেহেদির শুধু বাহির দেখে সে জানে মেহেদি তাজা সবুজ; কিন্তু যে মেহেদির অন্তরের সংবাদ রাখে সে জানে তাহার অন্তর শোণিতপাতে লালে লাল।”

দুকূলহারা

বড়দিন উপলক্ষ্যে কলেজের ছুটি হইয়াছে; কিছু করিবার নাই। শীতকালের মধ্যাহ্নে ঘুমাইলে অসুখ বোধ হয়; চুপ-চাপ অলসভাবে বসিয়া থাকাও যায় না। অগত্যা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া টো টো করিয়া ঘুরিয়া দিনগুলাকে-ফুঁকিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিলাম। পালা করিয়া কোনো দিন আলিপুর চিড়িয়াখানায়, কোনো দিন বা মুজিয়মে, এবং কোনো দিন বা পরেশনাথের বাগানে অনাবশ্যক হল্লা করিয়া মধ্যাহ্ন যাপন করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে হাতের কাছে যতগুলি গম্য স্থান ছিল সব ঘুরিয়া শেষ করিলাম, কিন্তু তখনো দেখি অনেকগুলা অলস মধ্যাহ্ন অবশিষ্ট থাকিয়া অবসানের

প্রতীক্ষা করিতেছে। তখন স্থির করা গেল শিবপুর কোম্পানীর বাগানে যাইতে হইবে।

আমরা পাঁচ বন্ধু মিলিয়া শ্যামবাজার হইতে ট্রামে সওয়ার হইয়া হাইকোর্টের ঘাটে উপস্থিত হইলাম এবং অনেক দরদাম করিয়া একখানা পান্সি ভাড়া করিলাম। নৌকাব্যূহ ভেদ করিয়া পান্সি গঙ্গার মাঝখানে উপস্থিত হইল। জোর জোয়ারের প্রতিকূলে ঝিঁকার চোটে নৌকা খুব দুলিয়া দুলিয়া ধীর মন্থর গমনে চলিতে লাগিল। মাঝিরা বাঙালী। তাহারা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। আমরাও তাহাদের গৃহপরিবার, সুখদুঃখ, আয়ব্যয় ইত্যাদির পরিচয় লইতে লাগিলাম। যে মাঝি হাল ধরিয়া ঝিঁকা মারিতেছিল, তাহার বাড়ী শুনিলাম রাণাঘাটের কাছে। কিন্তু তাহার বাংলা উচ্চারণ অতি অদ্ভুত রকমের। আমরা বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে একজন মাঝি বলিল, 'ও অনেক দিন দ্বীপান্তরে ছিল, তাই ওর কথা অমন হয়ে গেছে।' আমাদের কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। 'কেন দ্বীপান্তর গিয়াছিল? সেখানে কেমন ছিল? সেখান হইতে কবে ফিরিল?' ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। সেই মাঝি বলিল, 'বাবু, সে অনেক কথা, বলি শুনুন।—'

আমরা মাঝির কথা শুনিতে শুনিতে একাগ্র মনে কমলালেবু ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; মাঝি গল্প বলিতে আরম্ভ করিল—

ওর নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন যৌবনে খুব বলিষ্ঠ ছিল; তাহা উহার বৃদ্ধশরীরের কাঠামো দেখিলেই অনুমান করা যায়। গায়ে যেমন বল ছিল, মনেও তেমনি সাহস ছিল; ভয় বলিয়া সে কিছু জানিত না। বিষম গোঁয়ার বলিয়া গ্রামে

তাহার খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। উহার বয়স যখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর তখন তাহার গ্রামের জমিদারের সঙ্গে আর এক পার্শ্ববর্ত্তী-জমিদারের সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে। এই উপলক্ষ্যে খুব একটা দাঙ্গা হয়। অর্জ্জুন শুধু পেট ভরিয়া মদ খাইতে পাইবার লোভে এবং বীরত্ব দেখাইবার প্রলোভনে পড়িয়া পরিণাম চিন্তা না করিয়াই সেই দাঙ্গায় যোগ দিল। ফলে, খুনের দায়ে পড়িয়া আরো পাঁচজনের সঙ্গে দায়রার বিচারে অর্জ্জুনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। তাহার বাড়ীতে অসহায়া পড়িয়া রহিল তাহার শোকবিহ্বলা বৃদ্ধা মাতা ও সদ্য-বিবাহিতা বালিকা স্ত্রী।

আন্দামানে গিয়া অর্জ্জুনকে কিছুদিন সেখানকার গারদে থাকিতে হয়। তৎপরে সে মুক্তি পাইয়া সেই দ্বীপেই স্বাধীন ভাবে থাকিবার অধিকার পাইয়াছিল। সেই সময়ে একটি বাঙালিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। সেই সুদূর অপরিচিত সমুদ্রমেখলা দ্বীপে যাবজ্জীবনের জন্য স্বদেশ ও স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বজাতীয় একটি লোককে দেখিয়া চিরপরিচিত বন্ধুর মতো বোধ হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যে উভয়ে চির আত্মীয়ের মতো পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং স্বামী স্ত্রীর মতো একত্রে ঘরকন্না পাতিয়া বাস করিতে লাগিল। তবু মাঝে মাঝে সেই আজন্মপরিচিত, স্নেহে অভিষিক্ত, আদরে মধুর গ্রাম্য কুটীরখানির মধ্যে সর্ব্বউপদ্রবসহা মার শান্ত মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া অর্জ্জুনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

আর সেই স্ত্রীলোকটি—তাহার নাম ক্ষীরোদা—সে ব্রাহ্মণের মেয়ে, ভদ্রঘরের কুলবধূ! দেশে তাহারও ত পাতানো সংসার

জাজ্বল্যমান বজায় আছে। স্বামীর ঘরে সতীনের জ্বালায় তাহার সুখ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার বাপের বাড়ী ত বাপের আদরে, মায়ের স্নেহে, ভাইয়ের প্রীতিতে পরিপূর্ণ মধুর ছিল। থাকিলে কি হয়, তাহাতে তাহার সুখ ছিল না। স্বামীসোহাগে বঞ্চিতা হইয়া ক্ষীরোদার নারীহৃদয় অতৃপ্তিতে ক্ষুধিত হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। রমণী বাপের বাড়ীতে যত আদরেই থাকুক না কেন, সেখানে সে আপনাকে পরবাসিনী বলিয়াই মনে করে; আজন্মের আশ্রয়টিকে তাহার পরাশ্রয় বলিয়া মনে হয়; চিত্তের মধ্যে একটা হীনতার ক্ষোভ, একটা আহত অভিমানের অতৃপ্তি জাগিয়া উঠে। ক্ষীরোদা স্বামিগৃহের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়া সহ্য করিতে পারে নাই। বাপের বাড়ীর অজস্র অযাচিত স্নেহ সত্ত্বেও সে আপনার স্বামিগৃহের শরিক সতীনকে উপেক্ষা করিয়া, স্বামীর পক্ষপাত সহ্য করিয়া, আপনার গৃহে আপনার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিতে পারে নাই। একদিন কলহপ্রসঙ্গে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া ক্ষীরোদা একখানা দা দিয়া সতীনকে আঘাত করিল। তাহার দুর্ব্বল আঘাতে সতীন ত মরিল না, সেই কেবল সকল স্নেহবন্ধন হইতে, আপনার সমাজ ও স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অসংখ্য অপরিচিত নরনারীর মধ্যে নির্ব্বাসিতা হইল। ক্ষীরোদা বাঙালী ঘরের কুলবধূ, বহিঃসংসারকে সে ত গুণ্ঠন দিয়া একেবারে আড়ালে রাখিয়াছিল; অকস্মাৎ গারদ হইতে মুক্তি পাইয়া অদেখা দেশে অদেখা নরনারীর মধ্যে সে আপনার স্বাধীনতা লইয়া মহা মুস্কিলেই পড়িল। তাহার কয়েদই যে ছিল ভালো, সেটা তবু তাহার চিরাভ্যস্ত শ্বশুরবাড়ীর মতোই বোধ হইতেছিল।

অনভ্যস্ত স্বাধীনতা পাইয়া সে বিষম গোলে পড়িল, আপনাকে নিতান্ত অসহায়া ও একাকিনী বোধ করিতে লাগিল। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে সে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইল। একজন বাঙালীকে পাইয়া সে যেন মহাসমুদ্রে কূল দেখিল। অর্জ্জুন বাগ্দী বাংলা দেশে ক্ষীরোদার অস্পৃশ্য। কিন্তু আজ এই যমদ্বারে আসিয়া বাগ্দী ব্রাহ্মণের কৃত্রিম পার্থক্য ঘুচিয়া গেল; আজ উভয়ে পরস্পরের স্বদেশী; উভয়ে বিরাট নরসমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়; নিঃসঙ্গ প্রবাসে উভয়ে উভয়ের অবলম্বন। ক্ষীরোদা অর্জ্জুনকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। অর্জ্জুন ক্ষীরোদার আদর যত্নে একান্ত তাহার অনুগত হইয়া আপনার উদ্দাম বর্ব্বরতা ভুলিতে লাগিল। তথাপি এই নূতন পাতানো ঘরকন্নার মধ্যেও ক্ষীরোদার পুরাতন সুখদুঃখের স্মৃতি শত উপলক্ষ্য ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। সেই পল্লী-সঙ্গীদের সহিত উদ্দাম আনন্দ সম্ভোগের জন্য অর্জ্জুনের মনও মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া পড়িত, আর যখন-তখন তুচ্ছ উপলক্ষ্য ধরিয়া মনে পড়িত তাহার সেই বুড়ী মাকে; স্ত্রীর স্মৃতি অর্জ্জুনের মনে কোনো ভাবান্তর ঘটাইতে পারিত না।

এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। মহারাণীর জুবিলি উপলক্ষ্যে অর্জ্জুন মুক্তি পাইল। ক্ষীরোদা মুক্তি পাইল না। অর্জ্জুন মহা বিপদে পড়িয়া গেল। দুস্তর সাগরের এক পার হইতে তাহার মাতার পুরাতন স্নেহ তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল, আর এক পারে তাহার নূতন পাতানো ঘরকন্নার মধ্য হইতে ক্ষীরোদার আসক্তি তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে কাহাকে ত্যাগ করিয়া কোন দিকে যাইবে কিছুই ঠিক করিতে

পারিতেছিল না। এর চেয়ে তাহার বন্দীদশাও সে যে ছিল ভালো; নিশ্চিন্ত আরামে তাহার দিন ত কাটিত! কিন্তু দোটানায় এখন তাহার এ কি লাঞ্ছনা!

এদিকে অর্জ্জুনের মা জমিদার বাবুর নায়েব মশায়ের কাছে পুত্রের মুক্তি-সংবাদ পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইল; পুত্রের সহিত মিলনমাত্রবিযুক্তা বধূর গলা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুড়ী তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল।

বুড়ী পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিল। কিন্তু মাসের পর মাস গেল, কই তাহার নির্ব্বাসনমুক্ত পুত্র আপন গৃহে মায়ের কোলে ফিরিয়া ত আসিল না। বুড়ী কাঁদিয়া কাটিয়া নায়েব মহাশয়কে ধরিয়া পুত্রকে চিঠি দিল, ব্যাকুল হইয়া মিনতি করিয়া আহ্বান করিল। অর্জ্জুন চিঠির জবাব দিল বটে কিন্তু ক্ষীরোদাকে অসহায় ফেলিয়া কিছুতেই দেশে মায়ের কাছেও ফিরিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে অর্জ্জুন নায়েব মশায়ের আর এক চিঠি পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, তাহার বুড়া মা মরমর, অন্তিমকালে একবার পুত্রকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

অর্জ্জুন আর থাকিতে পারিল না; যে খুনে, তাহারও প্রাণ মায়ের অন্তিম ডাক শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষীরোদার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল, "ক্ষীরো, মা মরে, আমায় ত তবে যেতে হয়।" হায়! ক্ষীরোদা কেমন করিয়া বারণ করিবে, আর প্রাণ ধরিয়া কেমন করিয়াই বা এই নিতান্ত অপরিচিত দেশের একটিমাত্র আশ্রয় সে ত্যাগ করিবে! সে কিছু বলিতে পারিল না; অর্জ্জুনের বিশাল বক্ষে আপনার ক্ষুদ্র

মুখ চাপিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর আজ দ্বিতীয়বার নির্ব্বাসন হইতেছে।

অর্জ্জুন অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ক্ষীরোদার নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিল। যতক্ষণ আন্দামানের উপকূল মসীলেখার মতো দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ অর্জ্জুন জাহাজ হইতে অশ্রুপরিম্লান দৃষ্টিতে শুধু তাহাই দেখিতেছিল। অবশেষে কূল অদৃশ্য হইলে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-আবেগে জাহাজের ডেকের উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। দুদিন আগের এই ভীষণ নির্ব্বাসন-দেশ আজ একটি নারীচিত্তের মোহন প্রেমে মণ্ডিত হইয়া মহীয়ান ও পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশে আসিতে তাহার বুক কাঁপিয়াছিল সেই দেশ ছাড়িয়া যাইতে আজ বুক ফাটিয়া যাইতেছে!

অর্জ্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে পৌঁছিল। মাতার অন্তিম শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বালকের মতো কাঁদিল। বুড়ী অর্জ্জুনের মাথায় মুখে কম্পিত হস্ত বুলাইয়া "বা—বাঃ" বলিয়া ইহজীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মাতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া অর্জ্জুন যখন একটু শোক সামলাইতে পারিল তখন সে দেখিল তাহার স্ত্রী—যাহাকে একটুখানি বালিকা দেখিয়া গিয়াছিল—এই পনর বৎসর ধরিয়া নিটোল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও যৌবন সঞ্চয় করিয়া তাহারই জন্য অর্ঘ্য সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। শাশুড়ির কাছে মায়ের স্নেহযত্ন পাইয়া সে সুখে ছিল; স্বামীকে সে চিনিত না, স্বামীকে সে চাহেও নাই। এখন শাশুড়ির অভাবে সে অর্জ্জুনকেই আপন বলিয়া চিনিতে লাগিল। এখন অর্জ্জুনই তাহার আশ্রয়, সেই

তাহার একমাত্র অবলম্বন। অর্জ্জুনের কিন্তু মাঝে মাঝে সেই দ্বীপান্তরবাসিনী অভাগিনী ক্ষীরোদাকে মনে পড়িত; সে তখন ভালো করিয়া স্ত্রীর সহিত মিশিতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে অর্জ্জুনও স্ত্রীর সাহচর্য্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষীরোদার স্মৃতি আছে-না-আছে হইয়া গেল।

কুড়ি বৎসর নির্ব্বাসনে থাকিয়া ক্ষীরোদাও অবশেষে মুক্তি পাইল। সে পরম আগ্রহে, একবুক আশা উৎসাহ আনন্দ বহন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ক্ষীরোদা আপনার স্বামিগৃহে গেল না—সেখানে তাহার স্থান কখনো ছিল না, এখনো নাই। সে জাতিভ্রষ্টা, তাহার পিতৃগৃহেও তাহার স্থান নাই। যে অর্জ্জুন নীচজাতি হইয়াও তাহার কাছে প্রণয়ের স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে দেবীর আসনে বসাইয়াছিল, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া সেই অর্জ্জুনের গৃহই তাহার রমণীয় ও একমাত্র আশ্রয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে অনেক সন্ধান করিয়া অর্জ্জুনের গ্রামে গিয়া দেখিল, অর্জ্জুন আপন গৃহস্থলীর মধ্যে স্ত্রীপুত্রকন্যা-সমাবৃত হইয়া নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সে হতাশ হইয়া গেল। ধাঁ করিয়া আনন্দের আলো নিভিয়া গিয়া তাহার মনের ভিতরটা নিবিড় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। অর্জ্জুন স্তম্ভিতা ক্ষীরোদাকে দেখিয়া বলিল, "এস ক্ষীরো এস, তুমি আমার বাড়ীতেই এস।" ক্ষীরোদা এই স্নেহ-সম্ভাষণে কাঁদিয়া ফেলিল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "নাগো না, আমি সতীন সহিতে পারি নাই বলিয়া স্বামীকে একেবারে হারাইয়াছি, আমাকে তুমি বিশ্বাস করিয়ো না। আমার কোথাও স্থান নাই। তোমরা

সুখে আছ, সুখে থাক।” বলিতে বলিতে ঝড়ের মতো ছুটিয়া ক্ষীরোদা কোথায় চলিয়া গেল, অর্জ্জুন আর তাহার সন্ধান পাইল না।

প্রবাসী

আমি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে দেশভক্তির পুণ্যতীর্থ রাজপুতানা দেখিয়া তুল্যপবিত্র পঞ্জাব দেখিবার সাধ হইল। পঞ্জাবের রাজতীর্থ দিল্লী ও লাহোর, ধর্ম্মতীর্থ কুরুক্ষেত্র ও অমৃতসর দেখিয়া রণতীর্থ চিলিয়ানওয়ালা, সোবরাঁও, পাণিপত দেখিলাম। তারপর সেই—

> “গুরুদাসপুর গড়ে
> বন্দা যেখানে হইল বন্দী
> তুরানী সেনার করে,”—

সেইখানে গেলাম। গুরুদাসপুর দেখিয়া মনে হইল এই সঙ্গে একবার শিখবীরত্বের অন্যতম তীর্থ সুহিদগঞ্জও দেখিয়া যাইতে হইবে। সুহিদগঞ্জের নিকটে রেল বা ষ্টেশন নাই, পথ পর্ব্বত-বন্ধুর, অরণ্যজটিল। তথাপি মনে হইতে লাগিল—

> “পাঠানেরা যবে ধরিয়া আনিল
> বন্দী শিখের দল—
> সুহিদগঞ্জে রক্ত বরণ
> হইল ধরণীতল।”

সে জায়গা আমার দেখিতেই হইবে।

অনেক কষ্টে অশ্বপৃষ্ঠে তিন দিন চলিয়া, সুহিদগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলাম। সুহিদগঞ্জ একটি অতি ছোট সহর, শিখজাতির আবাসভূমি বলিয়া সেখানে একটি পল্টনের ছাউনি আছে—সেইজন্য সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহরে পৌঁছিয়া শুনিলাম সেখানকার কমিসেরিয়েট বিভাগের কর্ত্তা এক জন বাঙালী বাবু। তাঁহার নাম মাখনলাল শেঠ। এই সুদূর দুর্গম প্রদেশে একজন বাঙালীর অপ্রত্যাশিত দর্শনসম্ভাবনা আমাকে নিতান্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। আমি প্রথমেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম।

এক জন লোক মাখন বাবুকে চিনাইয়া দিল। তাঁহার অতি দীর্ঘ বিপুল বলিষ্ঠ চেহারা, গালপাট্টা দাড়ি, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি—কাহার সাধ্য তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া চেনে। আমি প্রথমতঃ তাঁহাকে পাঞ্জাবী মনে করিয়াছিলাম। তার পর যখন জানিলাম যে তিনিই মাখনবাবু, তখন আমি তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম—"আমি পর্য্যটক, দেশ দেখতে বেরিয়েছি, এখানে এসে শুনলাম যে এখানে আপনি বাঙালী আছেন, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" মাখন বাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন "হাঁ, সে ত আপনে ঠিক করেছেন, আপনে বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর কাছে না আসবেন ত কোথা যাবেন—গোরা বারিকে যাবেন নাকি? আপনি বসেন। বাবুর নামটি কি হচ্ছে?"

আমি দেখিলাম মাখন বাবু একেবারে খাঁটি পশ্চিমে বাঙালী। বাঙালীসঙ্গের যে সরস আনন্দ আমি আশা করিয়া আসিয়াছিলাম তাহার কোনোই সম্ভাবনা

নাই দেখিয়া আমি অপ্রসন্ন মুখে বলিলাম "আমার নাম বনমালী সেন।"

মাখন বাবু আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া বিনা প্রশ্নেই বলিলেন, "হামার নামটি হচ্ছে মখ্খনলাল শেঠ। হামার ঠাকুরবাবা পাঞ্জাবে কমিসেরিয়েটে নোকরি করতে এসেছিল। এসেছিল ত এসেছিল, এইখানেই রহে গেল। হামার বাপের পয়দা এইখানে, হামারও পয়দায়েশ পাঞ্জাবে। হামাদের বাড়ী শিয়ালকোটে আছে। বাবুর বাড়ীটি কুন্‌খানে হচ্ছে?"

"আমার বাড়ী কলকাতার কাছে।"

"একবার হামি কলকত্তা দেখিয়েছি—ওঃ বড্ডা ভারি সহর—হামাদের লাহোরসে ভি ভারি। হামি আর কথ্খনো দেখি না—একবার দেখলো, হামি বাংলা দেশে সাদি কুরতে গিয়েছিল। হামার সাদি আঠ বরষ হয়েছে।"

মাখন বাবু নিজের পরিচয় অনর্গল দিয়া যাইতেন বোধ হয়, হঠাৎ একটি ৫।৬ বছরের মেয়ে পাশের দরজার চিক ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মাখন বাবুর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "বাবা, বাবা, চুপ কর বলছি। মা বাবুকে মুখহাত ধুয়ে জল খেতে বললে।"

মাখন বাবু হাসিয়া বলিলেন "হাঁ হাঁ—হামি ভুলে গিয়েছিলো। বাবু বহুত দূরসে আসছে। তেখা সিং, বাবুজিকো গুসলখানামে লে যাও।"

আনন্দমূর্ত্তি পুলকচঞ্চল সেই মেয়েটিকে দেখিয়া আমার মন আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মাখন বাবুর মেয়েটিকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম

"তোমার নাম কি লক্ষ্মী ?" মেয়েটি দিব্য সপ্রতিভভাবে বলিল, "বা রে ! লক্ষ্মী কেন ? আমার নাম কুন্দকলি।" আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আচ্ছা কুন্দ, তোমার বাবা ত ভালো বাংলা বলতে পারেন না, তুমি ত দিব্যি বাংলা বল।" কুন্দ বলিল, "বাবা যে হিন্দুস্থানী, আর আমি আর মা যে বাঙালী।" মাখন বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমিও হাসিলাম, চিকের আড়ালেও একটু মৃদু হাস্যগুঞ্জন শুনিলাম। কুন্দ অপ্রতিভ হইয়া আমার বাহুবেষ্টন ছাড়াইয়া চিকের অন্তরালে ছুটিয়া পলাইল। কুন্দ যখন চিক তুলিল তখন দেখিলাম একটি তরুণী চিকের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখ মুখ হইতে আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে।

আমি স্নান সমাপন করিয়া আহারে বসিলাম। মাখন বাবুর স্ত্রী স্বয়ং পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলাম পঞ্জাবে থাকিয়া বাংলা দেশের পর্দাপ্রথা ইহাঁদের মধ্যে যথেষ্ট শিথিল হইয়া উঠিয়াছে। গৃহকর্ত্রীকে স্বহস্তে অতিথিসেবা করিতে দেখিয়া আমার চিত্ত এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমি আহার করিতে করিতে মাখনবাবুকে বলিলাম, "এখানে দেখবার কি আছে ?"

"এখানে পল্টন বারিক সেওয়ায় দেখবার লায়েক কুছু নাই", বলিয়া মাখন বাবু তাঁহার প্রকাণ্ড পাগড়ি-বাঁধা মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

মাখন বাবুর পত্নী অতি নম্র স্বরে বলিলেন, "কেন ? চন্দ্রা সীতার মায়ের জায়গাটা।"

"হাঃ, উয়ার আর বাবু কি দেখবে ? ছুটা নদীর বিচখানে

একটা জায়গা; উ রকম বাবু বহুত দেখেছে।" বলিয়া মাখন বাবু হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী নীরব হইয়া রহিলেন। আমি তাঁহার নীরবতার ভাষা বুঝিলাম—চন্দ্রা ও সীতার মাঝখানকার জায়গাটি, তাঁহার মনোরম লাগিয়াছে তাই অতিথিকেও দেখাইবার ইচ্ছা। আমি বুঝিয়া বলিলাম, "আমি আজকের দিনটা যখন আছি, তখন বিকেলে একবার সেইদিকে বেড়াতে যাব। কাল কখন এখান থেকে যাওয়ার সুবিধা হবে?" মাখন বাবু বলিলেন, "কাল যাবেন? সেটি হোবে না। আপনাকে এখানে আঠ রোজ থাকতে হোবে। কি বোলো কুন্দ?" কুন্দ লাজহসিত মুখে পিতার প্রকাণ্ড পা জড়াইয়া তাঁহার আড়ালে থাকিয়া কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কুন্দর মা অতি ধীরে জনান্তিকে বলিলেন, "এখন শিগগির যাওয়া হবে না।" আমি বলিলাম, "আমি দেশ ছেড়ে অনেক দিন এসেছি—এখানে অনর্থক বিলম্ব করায় আপনাদের অন্নধ্বংস করা ছাড়া আর ত কোনো লাভ দেখছি না।" মাখন বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "অন্‌ধ্বংস্! আপনে ত কুন্দসে ভি কম খান!" পুনর্ব্বার সেই বিরাট সরল হাস্য। কুন্দর মা বলিলেন, "আপনার লাভ নেই, আমাদের আছে। আপনি একমাস দেশ ছেড়ে এসে উতলা হয়ে উঠেছেন, আমি আট বচ্ছর দেশ ছাড়া, আমাদের কাছে একজন বাঙালী যে পরমাত্মীয়।"

মাখন বাবুর পত্নী সাক্ষাৎভাবে আমার সহিত কথা কহিলেন দেখিয়া আমিও তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে বলিলাম, "আপনি আট বচ্ছর দেশছাড়া! তবু ত এখনো বেশ বাংলা বলচে

পারচেন!" আমার এই বাক্য তাঁহার স্বামীর অসম্পূর্ণ বাংলাজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত বলিয়া তিনি লজ্জিতা হইয়া মুখ নত করিয়া একটু হাসিলেন। মাখন বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্য দ্বারা সরল প্রাণের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা ভুল্‌বে কেইসে? কেৎনা কেতাব পড়ে! হররোজ ত কলকত্তাসে কেতাব মাঙ্গাচ্ছে! চলেন আপনাকে সব দেখলাবো!"

আমি আহার করিয়া উঠিলাম। সেই পার্ব্বত্যদেশে পান পাওয়া যায় না, কুন্দ আমাকে মসলা দিল। আমি মসলা চিবাইতে চিবাইতে মাখন বাবুর সঙ্গে তাঁহার পত্নীর পুস্তকভাণ্ডার দেখিতে গেলাম, কুন্দ ও তাহার মাতাও আমাদের সঙ্গে আসিলেন। একটি ঘরে দেয়ালের গায়ে, দরজার মাথায়, তাকে, আলমারিতে অনেক বাংলা বই এবং খানকতক ইংরাজি বই সাজানো রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ পুস্তকই সেখানে সংগৃহীত দেখিলাম—পুস্তকগুলি প্রায়ই কবিতা, গল্প বা ইতিহাস-বিষয়ক। তাহাতেই বুঝিলাম এগুলি নারীর সংগ্রহ এবং সে নারী সাহিত্যরসিকা। ইংরাজি বইগুলি প্রায় শিকার, নয় ভ্রমণকাহিনী; বুঝিলাম এগুলি মাখন বাবুর সম্পত্তি। বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র প্রায় সবগুলিই এবং বাংলা সাপ্তাহিকও দু তিন খানি একটি টেবিলের উপর সুশৃঙ্খলায় সাজানো রহিয়াছে। পুস্তকভাণ্ডার দেখিয়া আমার মনে হইল—

"Around me I behold,
Where'er these casual eyes are cast
The mighty minds of old."

আমি বুঝিলাম একটি নির্ব্বাসিতা প্রবাসিনী বঙ্গকন্যা কেমন

সচেতন ভাবে ও সযত্নে আপনার দেশের ভাষা ও চিন্তার সহিত আপনার হৃদয়ের যোগ রাখিতেছেন। আমি সম্ভ্রমপুলকপূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে নীরবে অভিনন্দন করিলাম। তাঁহার সরমলহাস উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন আমার কানের কাছে বলিয়া গেল—

"My never-failing friends are they,
With whom I converse night and day!"

মাখন বাবু উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"এ এৎনা সব কেতাব পড়িয়ে লিয়েছে!" বলিয়া পত্নীগুণগর্ব্বিত দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে আরবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মাখন বাবুর স্ত্রী চকিতে আমার দিকে একবার চাহিয়া মুখ নত করিলেন।

আমি মাখন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিছু পড়েন না?"

কুন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমার মুখের প্রতি সকৌতুক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "আপনি বুঝি মনে করেছেন বাবা বাংলা পড়্‌তে পারে! কিচ্ছু পারে না, একটুও পারে না! মা বাবাকে আর আমাকে পেরথম ভাগ পড়ায়!"

মাখন বাবুর পত্নী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেন, মস্তক নত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি হাসিলাম। মাখন বাবুর হাসিতে ঘর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। হাসিতে হাসিতে মাখন বাবু বলিলেন, "হাঁ হাঁ হামি কুচ্ছু বাংলা জানে না। বেলা হামাকে বাংলা কেতাব শুনায়। ও হামি কুছ বুঝে উঝে না। বহুত বাংলা বাত হামি সমঝে না। এক কোউন বাঙ্গালী

মহারাজার শিকার-কাহিনী আউর দো একঠো ভ্রমণ-কাহিনী কুছ কুছ সমঝেছিলো।"

আমি মাখন বাবুর সরলতা, তাঁহার স্ত্রী বেলার মৃদুতা ও কুন্দর মাধুর্য্য হৃদয়ে অনুভব করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। দেখিলাম মাখন মাখনের মতোই কোমল, বেলা বেলার মতোই স্নিগ্ধ, কুন্দ কুন্দর মতোই উজ্জ্বল! মাখনের বিশাল বক্ষপঞ্জরের অভ্যন্তরে একখানি সরল প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া হাসির হিল্লোলে বাহির হইয়া আসিতেছিল; বেলার আঁখিপল্লবে একটি সরমমাধুরী তরুপল্লবে সন্ধ্যালালিমার মত ঝলিতেছিল; নদীবক্ষে প্রভাতরবির আলোকলীলার মতো একটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা কুন্দকলির চোখ মুখ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিলাম। তখন মাখনবাবু বলিলেন, "বাবু, আপনে এইখানে পঢ়বেন, শুবেন, যো খুসি করবেন; হামি এখন একবার আপিসে চল্‌লো; বিকালে এক সাথ বেড়াতে যাব।" মাখন বাবু চলিয়া গেলেন। তাঁহার পত্নীও আহার করিতে গেলেন, আমি কুন্দর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলাম।

"কুন্দ, তুমি আমার সঙ্গে দেশে যাবে?"

"আপনাকে ত আমি চিনি না; আপনার সঙ্গে যাব কেন? মা যখন যাবে তখন যাব। আমি আর মা শিগগির বাংলা দেশে আমার মামার বাড়ী যাব। বাবা যাবে না। দেখুন দেখুন, বাবা যাবে না কেন জানেন? হি হিঃ সে বড্ড মজা! বাবা বলে বাংলা দেশের কথা বাবা বুঝতে পারে না; বাবাটা ভারি বোকা! আমরা ত বাঙালী কিন্তু তবু আমরা ত হিন্দী কথা

বুঝতেও পারি বলতেও পারি! বাবা হিন্দুস্থানী কি না, বাংলা কিছু বোঝে না।"

কুন্দ এইরূপে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল; আমি মাঝে মাঝে এক আধটা কথার জোগান দিয়া তাহার বাক্যস্রোতটাকে অবাধ রাখিতেছিলাম। আঙুরটির মতো সেই নিটোল টুলটুলে মেয়েটির কথা হইতে যে রসধারা ক্ষরিত হইতেছিল আমি মুগ্ধচিত্তে তাহাই পান করিতেছিলাম, এমন সময়ে কুন্দর মা ঘরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি বকছিস কুন্দ, বনমালী বাবু পথে কষ্ট পেয়ে এসেছেন, ওঁকে একটু ঘুমুতে দে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঘুম ত আমার নিত্যই আছে, কুন্দকে ত আর আমি নিত্য পাব না। আমি এখন বুঝতে পারছি আপনি কেমন করে এই নিঃসঙ্গ প্রবাস যাপন কচ্ছেন।"

বেলা হাসিয়া বলিলেন, "তা সত্যি, কুন্দ আমার মস্ত সঙ্গী। তার সঙ্গে আর এই বইগুলির সঙ্গে কথা কয়েই আমি বেঁচে আছি।"

এই কথার মধ্যে তাঁহার যে প্রচ্ছন্ন মর্ম্মবেদনা ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম, "মাখন বাবু লেখাপড়ার চর্চ্চা করেন না, তিনি করেন কি?"

কুন্দ অমনি বলিয়া উঠিল, "বাবা খালি খালি শিকার করে বেড়ায়। দেখুন, বাবা একদিন একটা মস্ত বড় বাঘ মেরে এনেছিল—সেটা মস্ত বড়! বাবা রোজই হরিণ পাখী শিকার করে আনে আর খায়!"

"তুমি খাও না কুন্দ?"

"হুঁ খাই, কিন্তু বড্ড মায়া করে, আহা পাখী আর হরিণগুলি

কেমন সুন্দর! ওরা ত মানুষের কিছু ক্ষতি করে না। তবু বাবা ওদের মারে! বাবা ভারি নিষ্ঠুর!"

আমি বুঝিলাম এই বাক্যগুলি তাহার মাতৃ-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, নহিলে শিশু কুন্দ এত কথা বলিতে জানিত না।

এইরূপে আমরা প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে বিচরণ করিতে করিতে সাহিত্যপ্রসঙ্গে উপনীত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিষয় পড়তে বেশি ভালোবাসেন?"

বেলা স্মিত হাস্যে উত্তর করিলেন, "কবিতা।"

তখন আমি বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কাব্য-আলোচনা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম সকল কবির মর্ম্মস্থানটিতে তিনি দৃষ্টি ফেলিয়া তাঁহাদের নিগূঢ় পরিচয় জানিয়া লইয়াছেন।

বৈকাল বেলা মাখন বাবু আপিস হইতে আসিলেন। আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া টমটমে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম, বেলা ও কুন্দও সঙ্গে চলিলেন। আমরা সমস্ত সহরটা প্রদক্ষিণ করিয়া সহরের বাহিরে গিয়া পড়িলাম। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও বা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঠিয়াছে; মধ্যে মধ্যে এক একটা সরল দেবদারু বৃক্ষ কুঞ্চিতপ্রান্ত পত্রমন্দির মাথায় করিয়া মেঘ স্পর্শ করিবার আয়োজন করিতেছে; কোথাও বা আখরোটবৃক্ষের ঘননিবিড় পত্রকুঞ্জের মধ্যে দ্রাক্ষালতা বেড়িয়া উঠিয়াছে; গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ঝুলিতেছে; দূরে মেঘের গায়ে মিশিয়া শ্যামধূসর গিরিশ্রেণী স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে স্তব্ধ নিস্পন্দ সমুদ্রের মতো দেখা যাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "বাঃ, কি চমৎকার! প্রকৃতিলক্ষ্মীর আজ অপরূপ ঐশ্বর্য্যলীলা দেখ্‌লাম!"

মাখন বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বনমালী বাবু, আপনে কেতাবের জবানে যে বাত বোলেন ও হামি কুছ সমঝে না। বেলা সমঝে, উন্ন ভি কভি কভি এইসি .কেতাবী বাত বোলে!" আবার সমস্ত প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া মাখন বাবু হাসিয়া উঠিলেন।" বেলা আমার দিকে একটু চাহিয়া অল্প হাসিয়া মুখ নত করিলেন। আমি সেই ক্ষীণ হাসির মৃদু আলোকে একটু লজ্জা একটু অতৃপ্তির বেদনা দেখিতে পাইলাম।

কুন্দ অনর্গল বকিতে বকিতে চলিয়াছিল। সে আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া কখনো একটা খরগোশ কখনো বা একটা শেয়াল ছুটিয়া যাইতেছে দেখাইতেছিল। ক্রমে আমরা নদীর তীরে গিয়া পৌঁছিলাম। সুহিদগঞ্জের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক দিয়া দুইটি নদী প্রবাহিত—পূর্ব্বদিকে সীতা ও পশ্চিমদিকে চন্দ্রা। সহর হইতে একটু দূরে এক জায়গায় এই দুটি নদী নিতান্ত সন্নিহিত হইয়া একমাইল আন্দাজ পথ সমান্তরালে বহিয়া গিয়াছে। এই দুই সমান্তরাল নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান স্থানটি একটা বেশ চওড়া পথের মত, তাহার দুই ধারে পুষ্পস্তবকনম্র দীর্ঘ সরল কেলুগাছের শ্রেণী, নদীর পরপারে পর্ব্বত, নদীর তীরে অসংখ্য জলচর পক্ষীর সজীবতা ও কাকলি স্থানটিকে বিচিত্র সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিয়াছে, শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো নির্ম্মল প্রমুক্ত আকাশ হইতে পর্ব্বতে জলে গাছে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; নদীতীরের কেলুতরুবীথির মধ্যে মধ্যে আলো আঁধারের লুকাচুরি চলিতেছে; ঘন পত্রান্তরালের অন্ধকারও চাঁদের শুভ্র স্বচ্ছ আলোকে ভিজিয়া তরল হইয়া উঠিয়াছে; জলচর পক্ষিগণ থাকিয়া থাকিয়া কলরব করিয়া ডানা ঝাড়িতেছে,

ডানাঝাড়া জলশীকর মুক্তাচূর্ণের মতো ঝরিয়া পড়িতেছে, চিক্কণ মসৃণ সিক্ত ডানাগুলি চাঁদের আলোতে রূপার পাতের মতো জ্বলিয়া উঠিতেছে, জলের খরস্রোতে যেন দ্রবরজতধারা আলোড়িত হইতেছে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বেলা আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন —সেই নীরব হাসির অর্থ 'কেমন, আমি যেমন বলিয়াছিলাম তেমনি সুন্দর কি না!' আমার মুখে চোখে যে পুলক জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়াই বেলা বুঝিতে পারিলেন আমার মনের অবস্থা তখন কিরূপ। আমি মাখন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এখানে এমন জায়গায় বেড়াতে আসেন না?"

মাখন বাবু বলিলেন "হাঁ আসে, শিকার খেলতে আসে। দেখছেন না কেতো চিড়িয়া!"

হায় মূঢ়! আমি কি আজকার এই জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে জীবহিংসা বা উদরের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি! আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত যে আনন্দ তাহার সন্ধান কি তুমি কিছুই পাও নাই?

আমি পুনরায় বলিলাম, "আপনি এমনি জ্যোৎস্না রাত্রে বেড়াতে আসেন না?" মাখন বাবু বলিলেন "হাঁ, সে ভি আসে। চাঁদনি রাতে হরিণ বাঘ নদীমে জল পিতে আসে, তখন শিকার খেলি।"

আমি হতাশ হইয়া চুপ করিলাম। এই ব্যক্তিটি অনাবশ্যকের যে আনন্দ তাহার সন্ধান কিছুই জানে না দেখিয়া আমি বেলার অবস্থা স্মরণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইলাম।

খানিকক্ষণ বেড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। ফিরিয়া প্রস্তাব

করিলাম যে আমি পরদিন প্রাতঃকালেই যাইব। মাখন বাবু, বেলা, কুন্দ সকলেই প্রতিবাদী হইয়া পড়িলেন। অনেক যুক্তি তর্কের পর অবশেষে আমি জয়ী হইলাম বটে কিন্তু এই একদিনের পরিচিত পরিবারটির আসন্নবিচ্ছেদবেদনা বুকে লইয়া আমি শয়ন করিলাম। রাত্রে ভালো ঘুম হইল না।

প্রাতে উঠিয়া স্নান করিয়া বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া কুন্দকে তাহার মাকে ডাকিয়া দিতে বলিলাম। বেলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহজনম্র মুখখানির উপর একটি বিষাদের তরল ছায়া পড়িয়া মুখখানিকে করুণ করিয়াছে। আমি বলিলাম, "আমি তবে বিদায় হই।"

বেলা—না খেয়ে কি যাওয়া হয়? খেয়ে নিন।

আমি—এত সকালে আর কি খাব, কিছু খাবার যদি থাকে ত আমার সঙ্গে দেবেন পথে খাব।

বেলা—পথের পাথেয় ত দেবোই, এখান থেকেও কিঞ্চিৎ খেয়ে যেতে হবে। দেরি হবে না। খাবার তৈরি আছে, আপনি আসুন।

আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, গরম পোলাও ও মাংস আমার আহারের অপেক্ষা করিতেছে। মাখন বাবু ও কুন্দ সেই ঘরে বসিয়া আছেন। আমি বলিলাম, "এত কখন রাঁধলেন?" বেলা একটু শুধু হাসিলেন। মাখন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তিনটা রাতে উঠে ও এই সব করেছে।" আমি কৃতজ্ঞ ভাবে বলিলাম, "এত করা কেন?" মখন বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি এত পথ যাবেন কেতো কষ্ট হোবে, আপনার জন্যে আমরা বেশি কি করেছে?"

এই আতিথেয় দম্পতির সদাশয়তায় মুগ্ধ হইয়া ভাবভরা পরিপূর্ণচিত্তে আমি আহারে বসিলাম। বেলা কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এত শিগগির আমাদের ছেড়ে যাবেন তা ত আগে ভাবিনি, তাই খাবার বিশেষ কিছুই আয়োজন করতে পারিনি।" আমি হাসিয়া বলিলাম "পোলাওএর চেয়েও বেশি আর কি আয়োজন করতেন?" বেলা বলিলেন, "পোলাও ত ভারি! বাড়ীতে যথেষ্ট ঘিও ছিল না; ছাউনির খাজার রাত্রে বন্ধ, আনিয়ে নিতেও পারিনি। ঘৃতহীন পোলাও খেয়ে যান।"

এই কথায় মাখনবাবু ভারি সন্তুষ্ট হইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ ঘিউ বিন্ পোলাও! বনমালীবাবু, বেলা পাকা রসুইয়া, ঘিউ বিন্ পোলাও আপনাকে খিলাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "না, এতে স্নেহ পদার্থের কিছু কমি নেই, আপনারা যে স্নেহদান করেছেন তাতেই পোলাও সরস স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে, আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়েছে, কোথাও কিছু অভাব নেই।"

বেলা একটু হাসিলেন। মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন "বনমালী বাবু, আপনার কেতাবী বাত হামি কুছ সমঝলে না। আপনি কি যে বোলেন শুধু বেলা সমঝে! পোলাওমে ফিন স্নেহ কি?"

বেলা মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া বলিলাম, "না, আমি বলছিলাম যে আপনারা স্নেহ দিয়ে পোলাওএর ঘিয়ের অভাব পূরণ করে দিয়েছেন।" মাখনবাবু "ও হো হো" বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

আহার সমাপন করিয়া আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একদিনের পরিচিতকে বিদায় দিতে সমস্ত পরিবার আজ বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একদিনের আতিথ্যের পর বিদায় লইতে আমারও চিত্তে ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছিল। আজ কুন্দ পর্য্যন্ত মুখ বন্ধ করিয়াছে ; মাখনবাবুর উজ্জ্বল প্রফুল্ল চক্ষু দুটিও নিষ্প্রভ হইয়াছে ; বেলার স্নিগ্ধ দৃষ্টি প্রতিক্ষণে আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে। আমি কুন্দকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "যাই মা।" কুন্দ করুণনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আবার কবে আসবেন?" এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? জন্মে কখনো দেখা হইবে কিনা কে জানে।

মা

১

সুখচরের চক্রবর্ত্তীদের বধূ দয়াঠাকুরাণী যখন তাঁহার বহু মানত ও ব্রতসাধনার ফল একমাত্র ষষ্ঠীচরণকে লইয়া বিধবা হইলেন, তখন ষষ্ঠীচরণের বয়স মাত্র তিন বৎসর, দয়াঠাকুরাণীর বয়স তখন ত্রিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি অকস্মাৎ আপনার গৃহের গৃহিণী ও বিষয় আশয়ের কর্ত্রী হইয়া কিছু স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভাসুর রামরাম চক্রবর্ত্তী যখন অকস্মাৎ ভ্রাতৃবিয়োগে ব্যথিত হইয়া বধূমাতার বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন দয়াঠাকুরাণী

তাঁহার এই পরোপকারব্রতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দিয়া বলিলেন, "থাক, সে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, ষষ্ঠীচরণ যতদিন না মানুষ হয়, ততদিন আমিই কোনো মতে চালিয়ে যেতে পারব।" রামরাম চক্রবর্ত্তী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সাহসিকা রমণীর নিন্দা প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রস্থান করিলেন। কুলপুরোহিত সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য আসিয়া কহিলেন, "বৌমা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার ত' কিছুরই অপ্রতুল নেই, তুমি স্বামীর প্রীত্যর্থে সাবিত্রী-ব্রত ও পুত্রের কল্যাণার্থে কুক্কুটব্রত অনুষ্ঠান কর।" দয়াঠাকুরাণী বিনম্র বচনে বলিলেন, "স্বামীকে যদি তাঁর জীবদ্দশায় শুধু প্রীতি দিয়ে সুখী করে থাকতে পারি, পরলোকেও তিনি শুধু অন্তরের ভক্তি পেয়েই তৃপ্ত হবেন, প্রেমের নিষ্ঠাই আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত। আর পুত্রের মঙ্গলের জন্যে মার ব্যগ্র প্রাণ যা করবে তা শাস্ত্রাচার অপেক্ষা ঢের শ্রেষ্ঠ।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেলেন। কৃপণ বিধবার নিকট তাঁহার প্রাপ্তির কোনো আশা আর রহিল না।

দয়াঠাকুরাণীর নিন্দা প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপে, স্নানের ঘাটে, মুখুয্যেদের বৈঠকখানায় বিঘোষিত হইতে লাগিল। দয়াঠাকুরাণী সমস্তই শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও দমিলেন না। নিন্দা কুৎসা গায়ে না মাখিবার মতো তাঁহার চরিত্র স্বাধীন ও বলশালী ছিল।

গ্রামে তাঁহার আত্মীয়েরও অভাব ছিল না। যাহারা সকলের নগণ্য, যাহারা সকলের হেয়, যাহারা উপেক্ষিত, তাহারাই ছিল দয়া দেবীর আপনার জন। তিনি হাড়ি ডোম দুলে বাগদি প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির বাড়ী মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন।

তাহাদের নোংরা ছেলে মেয়েদের ছুঁইয়া আদর করিতেন, কাহারো পীড়া হইলে তাহার মলিন শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেন, বাড়ী ফিরিয়া স্নান করিতেন না, অবস্থা বিশেষে শুধু হাত পা ধুইয়া, খুব বেশি ত কাপড়খানা ছাড়িয়াই, তিনি আপনাকে শুচি বোধ করিতেন, একটু গঙ্গাজল পর্য্যন্ত স্পর্শ করা আবশ্যক বোধ করিতেন না। কেহ অন্ততঃ পক্ষে একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে বলিলে তিনি উত্তর করিতেন, "এক ঘড়া পুকুর জলে যদি আমি শুচি না হয়ে থাকি, এক ফোঁটা গঙ্গাজলে আর আমায় বেশি কি শুচি করবে?" এ উত্তরে পল্লী-বিধবাগণ অবাক্ হইয়া শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করিত।

দয়াদেবীর অনাচারের জন্য যখন তথাকথিত ভদ্রসমাজের নরনারী বিমুখ হইয়া তাঁহার ম্লেচ্ছ-সংসর্গ ত্যাগ করিল তখনও তিনি ভীত হইলেন না, অথবা আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন না। সকল দরিদ্র, সকল নির্য্যাতিত, সকল উপেক্ষিত নরনারী তখন তাঁহার পরমাত্মীয়, এবং তাঁহার প্রেমবদ্ধ অনুচর সেবকও অগণ্য।

দুলে বাগদির ছেলেরা অপর কোনো শুচিবায়ুগ্রস্তা রমণীকে দেখিয়া "ওরে বাম্‌নী আসছে, পথ ছেড়ে দাঁড়া" বলিয়া ম্লান কুণ্ঠিত মুখে অপথে গিয়া দাঁড়ায়; স্নানের সময় পাছে গায়ে জলের ছিটা লাগে বলিয়া নিতান্ত সঙ্কোচভয়ে স্নান করে; আর দয়া দেবীকে দেখিয়া তাহারা মা বলিয়া হাসিয়া নাচিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে; শিশুহৃদয় সমগ্র গ্রামের মধ্যে কেবল এক জনের কাছে হৃদয়ের পরিচয়, স্বাধীনতার সংবাদ পাইয়া কৃতার্থ

হয়। অন্ত্যজ পুরুষেরা দয়া দেবীর অভিলাষ জানিবামাত্র তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, নারীগণ আপনাদের গৃহপ্রাঙ্গনের তরি তরকারী দিয়া আপনাদের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে প্রতিযোগিতা করে।

একদিন দয়া দেবী সমাগতা রমণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, মোছলমান বউ অনেকদিন এদিকে আসেনি কেন? তার কেউ কিছু খবর জানিস্?"

একজন বলিল, "তার মা, বড় ব্যামো, বাঁচে কি না বাঁচে। আহা মাগী মোলে তার ছেলেটার কি যে আবস্থা হবে কে জানে? আহা মাগী বড় ভালো মানুষ ছিল। মোছলমান ত' নয়, যেন হিঁদুর ঘরের বিধবা, এমনি তার নিষ্ঠে, এমনি তার মন।"

সমবেত রমণীগণ সকলেই সেই মোছলমান বউয়ের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। দয়া দেবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দুলে বৌ, তুই একটু আমার সঙ্গে যাবি? আমি একবার মোছলমান বউকে দেখতে যাব।"

দুলে বউ বলিল, "তা কেন যাব না মা, কিন্তু সে যে অনেকটা পথ।"

"তা হোক, আমি একবার যাব" বলিয়া দয়া দেবী যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া তাহার কোণে কোণে কিছু সাগু, বার্লি, মিছরি, কিসমিস, একটু আমসত্ব বাঁধিয়া লইলেন, আর আপনার অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া লইলেন পাঁচটি টাকা।

মুসলমান বধূটির গৃহ গ্রামান্তরে, প্রায় এক মাইল পথ হইবে। মুসলমানী তাহার পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে পঁচিশ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র জহর আলিকে কোলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। সে নিঃস্ব চাষীর গৃহিণী ছিল; বিধবা হইয়া আপনার শিশু-পুত্রটির লালন পালনের জন্য সে বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সামান্য চাষীর ঘরে জন্মিয়াও আসমানীর এমন একটি প্রস্ফুট অথচ স্নিগ্ধ শ্রী ছিল যাহা চাষীর ঘরে দুর্লভ, আর সেই ললিত শ্রীকে মহিমান্বিত করিয়াছিল তাহার শ্রমপটু নিটোল স্বাস্থ্য ও কোমল মধুর প্রাণটি। এত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য যাহার তাহাকে আশ্রয় দিবার পুরুষের অভাব কথনই ঘটে না। অনেকে তাহাকে নিকা করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আসমানী সেসকল প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়াছিল, "খোদার দোয়াতে যার ছেলেকে আমি কোলে পেয়েছি, তার ছেলেরই মা হয়ে আমি মরব, খোদাতালার দোয়াতে জহর আমার বেঁচে থাকুক।" অতঃপর আসমানী চিঁড়া কুটিয়া ধান ভানিয়া আপনার শিশু পুত্রকে পালন করিতে লাগিল।

আসমানী দয়াঠাকুরাণীর বাড়ী চাল চিঁড়ার উঠানা দিত। দয়া ঠাকুরাণী যথন আসমানীর হৃদয়ের ইতিহাস শুনিলেন, তাঁহার নিজের পতিপ্রেমনিষ্ঠ মাতৃহৃদয় আর একটা হৃদয়ে আপনারই প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অনুরক্ত হইল; সেই দিন হইতে মোছলমান বউ দয়াঠাকুরাণীর পরমাত্মীয় সখীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল। গ্রামের লোক দয়া ঠাকরুণের কাণ্ড দেখিয়া আরও ছি ছি করিয়া উঠিল।

দয়াঠাকুরাণী যথন আসমানীর দীন কুটীরে আসিয়া উপনীত হইলেন তথন আসমানীর অন্তিমকাল। দয়াঠাকুরাণী তাহার

শিয়রে বসিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিলেন, "মোছলমান বউ, আমি এসেছি। চিনতে পার?"

আসমানী চোখ মেলিয়া বলিল, "এঁ্যা কে? দিদিঠাকরুণ এসেছ? খোদার বড় মেহেরবানি,! দিদিঠাকুরুণ আমার জহর রইল, তাকে দেখো, সে তোমার ষষ্ঠীর নফর।"

দয়া দেবী অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বলিলেন, "জহর ষষ্ঠীর নফর নয়, ষষ্ঠীর ভাই। জহর, বোন, আমারই ছেলে।"

"এখন আমি সুখে মরতে পারব। দিদি, জহরকে আমার বুকে দেও, আমি মরে গেলে জহর তোমারই গলগ্রহ।"

পুত্রকে বুকে লইয়া আসমানীর মৃত্যু হইল। সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মির মতো একটি ক্ষীণ হাস্যজ্যোতি তাহার সুখমৃত্যু ঘোষণা করিল।

২

জহর আলি এখন হিন্দুমাতার নিকট জহর লাল। সে ষষ্ঠী-চরণের ক্রীড়া-সহচর, সে অশনে বসনে, আদর মমতায় ষষ্ঠী-চরণের সমকক্ষ, উভয়ে একত্রে পাঠশালে যায়। কিন্তু সেই শিশু আপনার মাকে কি ভুলিতে পারিয়াছিল?

দয়াঠাকুরাণী যথেষ্ট স্বাধীন ও কুসংস্কারমুক্ত হইলেও ঠিক সহজভাবে জহরকে আদর যত্ন করিতে পারিতেন না। একই ঘরে হইলেও তাহার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিছানা ছিল। শয়নগৃহ যথাসাধ্য আসবাবশূন্য করা হইয়াছিল, পাছে জহর সেসকল স্পর্শ করে। অন্যান্য ঘরেও সর্ব্বদা সতর্কভাবে শিকল দেওয়া থাকিত, বালক জহর প্রবেশ না করে। আহারের সময় ষষ্ঠী-চরণ ও জহরকে একটু তফাতে তফাতে বসানো হইত; ষষ্ঠীকে

মা খাওয়াইয়া দিতেন এবং জহর অন্ন স্পর্শ করিবার আগেই তাহার ভাত মাখিয়া গ্রাস ভাগ করিয়া দেওয়া হইত, এবং বালক জহর ভালো করিয়া খাইতে না পারিলে দয়া ঠাকুরাণী একটু তফাতে বসিয়া বাক্যে ইঙ্গিতে তাহাকে উপদেশ দিতেন, কখনো কখনো বা বাড়ীর কৃষাণ আলিজানকে ডাকিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। খাইতে খাইতে এক একদিন শিশু জহর অকারণে কাঁদিয়া ফেলিত, তাহার সে উচ্ছ্বসিত অশ্রু সহজে থামিতে চাহিত না। সেই শিশুচিত্তে স্নেহতারতম্য কি আঘাত করিত? শিশুচিত্ত কি এত সূক্ষ্ম অনুভবনশীল?

একদিন বর্ষার বিরস সন্ধ্যায় চারিদিক মেঘে গম্ভীর আচ্ছন্ন হইয়া স্তম্ভিত হইয়া ছিল; সিক্ত শীতল বায়ু একটু জোরেই বহিতেছিল। অঙ্গনে কর্দ্দম, গগনে অন্ধকার। এমনি দিনে নরনারীর প্রাণে একটা নিবিড় মিলন, একটা মধুর সঙ্গ, একটা প্রগাঢ় স্নেহ লাভ করিবার ব্যাকুল বাসনা জাগ্রত হয়। নিকর্ম্মা শিশুচিত্ত আজ দোলাই জড়াইয়া ঘরের দাওয়ায় চুপটি করিয়া বসিয়া থাকাকে বড় ক্লান্তিকর মনে করিতেছিল। ষষ্ঠীচরণ বসিয়া বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জহর বসিয়া বসিয়া স্তব্ধ গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। দয়াঠাকুরাণী মালাজপ করিতে করিতে বলিলেন, "জহর, ঘুম পেয়েছে? যাও বাবা, ঘরে আপনার বিছানায় গিয়ে শোওগে, আমিও জপ সেরে যাচ্ছি।"

জহর শুধু বলিল, "এখনো ঘুম পায় নি।" শিশু-নেত্রের ঘুম আজ কিসে টুটিয়াছে?

দয়াঠাকুরাণী মালাজপ শেষ করিয়া আপনার নিদ্রিত পুত্রকে বুকে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "চল জহর, ঘরে চল।"

জহর বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

দয়াঠাকুরাণী বলিলেন, "শোও বাবা, শোও।"

জহর নড়িল না।

দয়াঠাকুরাণী আবার বলিলেন, "শোও বাবা, রাত হয়েছে, ঘুমোও।"

জহর তথাপি নির্বাক নিশ্চল।

দয়াঠাকুরাণী ষষ্ঠীকে বিছানায় শোয়াইয়া উঠিয়া আসিয়া জহরের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া তাহার দাড়িতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা, বল কি চাই?"

তখন সেই সাত বৎসরের বালক মাথা নীচু করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকল বলে সকল দ্বিধা সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া অতি করুণ মিনতির স্বরে বলিল "মা, তুই আমাকে একবার আপনার মার মতন কোলে নে না।"

শিশুর মুখে এ কি নিদারুণ করুণ বাণী! দয়াদেবীর প্রাণ ফাটিয়া যাইবার মতন হইল, তিনি বাষ্পাকুল লোচনে দু বাহু মেলিয়া জহরকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তাহাকে কোলে উঠাইয়া তাহার মুখ চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন, হিন্দুবিধবার সকল আচার আজ হৃদয়ের কাছে, প্রেমের কাছে, থর্ব্ব হইয়া গেল! জহরকে কোলে করিয়া দয়াদেবী বড় কান্নাটাই কাঁদিলেন, আর মাতৃস্নেহ-রসতৃপ্ত জহর তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পরম সুখে হাসিমুখে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন দয়াদেবী আপনারই শয্যার এক পার্শ্বে

তাহাকে শোওয়াইয়া নিজে উভয় পুত্রের মধ্যে শয়ন করিলেন। সেদিন হইতে সকল ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। দয়াদেবী গ্রামে পতিতা হইলেন।

৩

ষষ্ঠী ও জহর বড় হইয়াছে। তাহারা উভয়েই এফ, এ, পাশ করিয়াছে। ষষ্ঠী ঠিক করিল সে বি, এ, পড়িবে; জহর বলিল, সে পুলিসের দারোগাগিরির পরীক্ষা দিবে। ইহা শুনিয়া ষষ্ঠী বলিল, "ছি ছি, যে চাকরী দেশের লোকের হেয়, তাই তোমার চরম অবলম্বন ঠিক করলে।" জহর গম্ভীর ভাবে বলিল, "না করে' করি কি? যত শীঘ্র হয় আমাকে উপার্জ্জন করতে হবে, আর কতকাল পরের গলগ্রহ হয়ে থাকব!" ষষ্ঠী আর তাহাকে কিছু বলিল না, কথাটা মাকে বলিল।

দয়াঠাকরুণ জহরকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে জহর, আমি তোর পর, আর তুই আমার গলগ্রহ!"

জহর নিরুত্তর হইয়া শুনিল মাত্র। কিন্তু আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না।

শৈশবে মাতৃস্নেহ লইয়া উভয় শিশুর মধ্যে যে ঈর্ষা জন্মিয়াছিল, অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত বঞ্চিত জহরের সেই ব্যথা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছিল, এবং ক্রমশ জহরকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। তাই সে আজ স্বাধীন হইবার জন্য, ষষ্ঠীর মার অনুগ্রহ এড়াইবার জন্য অকস্মাৎ বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠী থাকিতে না পারিয়া রাত্রে আবার জহরকে বলিল, "জহর, ভালো করে ভেবে চিন্তে কাজ কোরো। আজ যে-তোমাকে লোকে যতটা শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, সেই তোমাকে কাল

পুলিসের পোষাক পরা দেখে ততটা শ্রদ্ধা, ততটা বিশ্বাস করতে সঙ্কুচিত হবে, এমন ঘৃণ্য অধম যে জীবিকা তার চেয়েও কি মার স্নেহদান হেয় ?"

"হেয় শ্রেয় আমি জানি না, অত কথার মারপেঁচও বুঝি না। দেশের হাজারো লোক পুলিসের কাজ করচে, আমিও করব। আর, পুলিসে যে কাজ করে সেই কি বদমাইস, ভালো লোক কি পুলিসে নেই ?"

"থাকতে পারে। কিন্তু আমি জানি কত লোক আগে দেবতার মতো ছিল, পুলিসের কাজে গিয়ে পিশাচ হয়েছে। পুলিশের অনেকেই মন্দ বলেই ত' দুর্নাম। আমাদের অন্ন যদি এই বারো বৎসর হজম হয়ে থাকে, তবে আরো কিছুদিন হজম হবে, তুমি মেডিকেল কলেজে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাও।"

"ও বাবা, পাঁ—আঁচ বচ্ছর ?"

"তবে বি, এ, পাশ করে বি, এল, দিয়ো।"

"সেও ত' চার বচ্ছর।"

"তবে পি, এল, পড়।"

"তবু দুবচ্ছর।"

"তবে মোক্তারী দেও।"

"এফ, এ, পাশ করে মোক্তার ?"

"ক্ষতি কি। পুলিসের চেয়ে ভালো।"

"ছি! কক্‌খনো না।"

"তবে দারোগা হওয়াটা নিতান্তই বাঞ্ছনীয় ?"

"নিতান্তই।"

"বেশ!"

দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়িয়া গেল।

এবারে মার বুঝাইবার পালা। দয়াঠাকুরাণী জহরকে বলিলেন, "বাবা, চাকরীই যদি তোর নিতান্তই করতে হয়, অন্য চাকরী কর না; আরো ত' ঢের আপিস আছে।"

"অন্য চাকরীতে মা পয়সা নেই, পুলিসের চাকরীতে দুপয়সা তবু আছে।"

"ছি বাবা, একি তোর কথা? একি আমার ছেলের উপযুক্ত কথা! মাইনের অতিরিক্ত যে উপরি পাওনা সে ত চুরি?"

"না মা চুরি না করেও পয়সা রোজগার করা যায়, অনেক জমিদার বড় লোকে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে উপহার দেয়।"

"সে উপহার নয়, ঘুষ।"

"ষষ্ঠী তোমায় এই রকমই বুঝিয়েছে। আমার কথা তুমি বুঝবে না। যাই হোক, আমি আর ষষ্ঠীর অন্নদাস হয়ে থাকচি নে। ষষ্ঠীর অনুগ্রহ পেয়ে জীবন ধারণ করা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

"ষষ্ঠীর অনুগ্রহ না মনে করে তোর মার স্নেহদান মনে করলেও ত' পারিস।"

"সে ত' কল্পনা, সত্য যে অন্যরূপ।"

দয়াঠাকুরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, "সত্য কি তা' ভগবান জানেন, একদিন তুইও জানবি। জহর, তুই আমার বড় দুঃখের ছেলে। তোকে যেদিন থেকে কোলে পেয়েছি, সেদিন থেকে অনেক দুঃখ আমায় সহ্য করতে হয়েছে; কিন্তু সে সবের চেয়েও আজ আমার বড় দুঃখ যে তুই তা বুঝলিনে। আমি আর কি বলব, ঈশ্বর তোকে শুভমতি দিন।" তাঁহার মনে পড়িল

এই জহরের জন্য তিনি কতখানি ত্যাগ, কতখানি নিন্দা, কতখানি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, সে কথা তিনি ষষ্ঠী বা জহর কাহাকেও জানিতে দেন নাই। আজ সেই দুঃখপালিত জহরকে বিদ্রোহী দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে বেদনা জাগিয়া উঠিল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

৪

জহর চারি বৎসর দারোগা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন নবাবগঞ্জে আসিল তখন ষষ্ঠী এম, এ, পাশ করিয়া নবাবগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এতকাল পরে আবার দুই ভাইয়ের মিলন হইল। ভবিতব্য!

জহর সুখচর ছাড়িয়া ষষ্ঠী বা তাহার মাতার কোনো সংবাদই রাখে নাই। এতদিন পরে ষষ্ঠীকে দেখিয়া সে বিশেষ খুসি হইল না। জহর এখন পুরাদস্তুর পুলিস, হৃদয় নামক পদার্থটা প্রশ্রয় না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

নবাবগঞ্জ স্বদেশীভাবের প্রধান আড্ডা, জেলার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জহরকে ডেমি অফিসিয়াল চিঠি লিখিলেন, হুঁসিয়ার! জহর প্রত্যুত্তরে লিখিল, যো হুকুম খোদাবন্দ! জহর গোপনে গোপনে বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি কাগজের পাঠকের নাম সংগ্রহ করিতে লাগিল; কে কে সাধ্যপক্ষে স্বদেশীব্রত পালন করিতেছে তাহাদের সন্ধান লইল; এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য পড়িল তাহার ষষ্ঠীচরণের উপর।

একদিন এক স্বদেশী-দ্রব্য-বিক্রেতা আসিয়া ষষ্ঠীচরণকে বলিল, "মাষ্টার বাবু, শুনেছি দারোগাবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে। আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমায় যদি রক্ষা করেন।"

ষষ্ঠীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

দোকানদার বলিল, "দারোগাবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে শাসিয়ে বলেছেন, তাঁকে দুশো টাকা না দিলে তিনি আমার দোকান আর বাড়ী লুট করাবেন।"

শুনিয়া ষষ্ঠীচরণের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। ষষ্ঠী জহরের সঙ্গে দেখা করিয়া তীব্র ভৎ'সনার স্বরে বলিল, "জহর, তুমি অধঃপাতে গেছ জানি, কিন্তু একেবারে যে জাহান্নমে গেছ তা জানতাম না। এ সব কি ব্যাপার ? দুর্ব্বল নির্দ্দোষীকে পীড়ন করায় তোমার কী পৌরুষ ?"

এ ভৎ'সনায় জহরও ক্রুদ্ধ হইল, বলিল, "যাও যাও, নিজের চরকায় তেল দেও গে যাও। আমি ত' আর তোমার স্কুলের ছাত্র নই যে চোখ রাঙানি দেখে ডরাব।"

ষষ্ঠীচরণ উদ্যত ক্রোধ কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া বলিল, "ষষ্ঠীচরণ নবাবগঞ্জে থাকতে তুমি কোনো জুলুম করতে পারবে না।"

জহর একটু হাসিয়া বলিল, "সে দেখা যাবে।"

সেইদিন হইতে জহর সপ্তাহে সপ্তাহে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ষষ্ঠীচরণের নামে নানাবিধ রিপোর্ট করিতে লাগিল। ষষ্ঠী স্কুলের ছাত্রদের লইয়া বাজারে লোককে বিলাতী-দ্রব্য কিনিতে বাধা দেয়, ক্রীত বস্তু কাড়িয়া জ্বালাইয়া লোকসান করে, বিলাতী পণ্যের ব্যবসায়ীদিগকে মারপিট করিবার ও ঘর জ্বালাইয়া দিবার ভয় দেখায়, এবং সর্ব্বোপরি ষষ্ঠী কার্লাইল সার্ক্যুলার অমান্য করিয়া ছাত্রদিগকে রাজদ্রোহে তালিম দিতেছে।

উপর হইতে গোপন হুকুম আসিল যেমন করিয়া পার

ষষ্ঠীচরণকে বন্দ কর। জহর চিঠি পড়িয়া মুচ্‌কি হাসিয়া গোঁফে চাড়া দিল।

সেই দিন বাজারের মাতব্বর গোলদার সলিম-উল্লা, দারোগা সাহেবের আহ্বানে থানায় গিয়া, ঘণ্টা দুই গভীর পরামর্শের পর বড় গম্ভীরভাবে ফিরিয়া আসিল।

সেই দিন রাত্রি প্রায় দুটার সময় সলিম-উল্লার বিলাতীপণ্যের দোকানে আগুন লাগিল। দেখিতে দেখিতে আগুন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। বাজারে মহা চীৎকার, ব্যস্ততা ও সোরগোল লাগিয়া গেল। ষষ্ঠীচরণ এই গোলমালে ঘুম হইতে উঠিয়া দিগ্‌দাহকর বহ্নিশিখা দেখিল এবং অমনি তূর্য্যধ্বনি করিয়া স্কুলের ছাত্রগঠিত আশাবাহিনীকে আহ্বান করিল। স্কুলের প্রথম তিন ক্লাশের ছাত্রগণ ত্বরিতে ষষ্ঠীচরণের গৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং ষষ্ঠীর পশ্চাতে পশ্চাতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে নৈশ গগন ধ্বনিত করিয়া বহ্নিনির্ব্বাণ করিতে ছুটিল। ষষ্ঠীচরণের নেতৃত্বে আশাবাহিনী হাটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে জহর আলির আদেশে কনেষ্টবলগণ তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ এই বাধা পাইয়া ছাত্রবৃন্দ ক্ষেপিয়া গেল, পুলিশের সহিত "বন্দে মাতরম্" হাঁকিয়া মারামারি যুড়িয়া দিল। ষষ্ঠী ব্যাপার বুঝিয়া বালকদের থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই উভয় পক্ষেই রক্তপাত হইয়া গেছে, এবং সকলে পুলিস ও ক্রুদ্ধ দোকানীদের দ্বারা ধৃত হইয়াছে।

বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে গভীর রাত্রে বিলাতীপণ্য-ব্যবসায়ীর দোকানঘর জ্বালানো, দোকান লুঠ, মারপিট ইত্যাদি

বহুতর অপরাধের নালিশ সহ ষষ্ঠীচরণ ও ছাত্রবৃন্দ জেলায় চালান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার, আসামীদের জামিন নামঞ্জুর করা হইয়াছে, আসামীরা হাজতে।

দয়া ঠাকুরাণী পুত্রের বিপদের কথা শুনিলেন। তিনি নিজেই জেলায় গিয়া হাজতে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিলেন। ষষ্ঠীচরণ মাকে দেখিয়া ক্ষোভে রোষে উত্তেজিত হইয়া কহিল, "মা, জহর এই কাজ করেছে।"

মা শান্ত স্বরে কহিলেন, "বাবা, জহর তোর অবোধ ছোট ভাই! তার ওপর তুই রাগ করিসনে। সে আমাদের ছেড়েছে বলে' আমরা তাকে ছাড়তে পারিনে। তুই আপন কর্ত্তব্য করেছিস, ফলের ভার ভগবানের উপর। যে পবিত্র বন্দে মাতরম্ নাম গ্রহণ করে' তুই সেবাব্রত গ্রহণ করেছিস, তাতে নির্য্যাতন-ক্লেশ সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তুই যদি হাসিমুখে সহ্য করতে পারিস, আমি আপনাকে ধন্য মনে করব। আর এক কাজ তোকে করতে হবে, জহরকে বাঁচিয়ে তোর আত্মসমর্থন করতে হবে।"

ষষ্ঠীচরণ মার মহত্বে মুগ্ধ হইয়া কহিল, "আত্মসমর্থন করতে গেলে জহরকে দোষী করা ছাড়া ত' উপায় দেখিনা মা।"

মা অকম্প কণ্ঠে কহিলেন, "তবে তোর আত্মসমর্থনে কাজ নেই। কিন্তু নিরপরাধী বালকগুলির কি উপায় হবে?"

অমনি কতকগুলি কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "মা, আমরাও তোমার কুপুত্র নই, আমরা একটুও ভয় পাইনে, আমরা কেউ কিছু বলব না, আদালত যা খুসি, তাই করুক।"

দয়াঠাকুরাণী বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, বাপসকল, এই

হৃদয়বল লাঞ্ছনাতে দ্বিগুণিত হোক। যে মাকে বন্দনা করে' ব্রত গ্রহণ করেছ, তাঁর মুখ উজ্জ্বল কর।"

৫

আজ ষষ্ঠীচরণের বিচার। এজলাস লোকারণ্য। উকিল যাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সকলের একই উত্তর, "বলিব না।" আসামী পক্ষের উকিল বলিলেন, তাঁহার মক্কেলরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন না; সাফাই সাক্ষীও দিবেন না। আদালতের যাহা খুসি করিতে পারেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীদের কথা বিশ্বাস করিয়া এবং জহর আলি দারোগার কর্ম্মপটুতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া ষষ্ঠীচরণের ছয় মাস ও ৫ জন বালকের দুই মাস করিয়া কারাদণ্ড বিধান করিলেন। অন্যান্য বালকেরা সনাক্ত করার গোলমালে ও প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইল।

জহর আলি যখন উৎফুল্ল হইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া থানায় ফিরিল, তখন একখানি গোরুর গাড়ী আসিয়া থানায় লাগিল। গাড়োয়ান গিয়া সেলাম করিয়া দারোগা সাহেবকে জানাইল, একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। জহর আলির মনটা আজ প্রফুল্ল ছিল; তাহার উপর স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া গাড়ীর সামনে দাঁড়াইল এবং গাড়োয়ান গাড়ীর মুখের পর্দ্দা উঠাইয়া ধরিল।

জহর বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা!"

গাড়ী হইতে নামিয়া দয়া দেবী বলিলেন, "হাঁ বাবা জহর, তোর মা। আমি তোকে তোর মায়ের বুকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।"

অকস্মাৎ এই স্নেহের আহ্বান জহরকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে মার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা, এলে যদি তবে আর কিছু দিন আগে এলে না কেন ?"

মা পদানত সন্তপ্ত পুত্রকে বুকে উঠাইয়া বলিলেন, "এর আগে এলে তোকে ফেরাতে পারতুম না, জহর ;—তুই মনে করতিস আমি বুঝি ষষ্ঠীকে বাঁচাবার কৌশল পেতেছি। আজ আমি পুত্রহারা, আজ তোকে ফিরতেই হবে, আজ ত আর তোর মার স্নেহের শরিক কেউ নেই।"

জহর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "মা, আমি ফিরব, আবার তোমার ছেলে হব।"

মা পুত্রকে বুকে চাপিয়া বলিলেন, "জহর মানে রত্ন ; এতদিন আমি মণিহারা হয়ে ছিলাম !"

জহর বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "মা, তুমি কি ভুলে গেলে যে আর এক জহরের মানে বিষ ? আমি ঢের জালিয়েছি, নিজে জলেছি। কিন্তু আর না, এবার মা তোমার কোলে ফিরব !"

জহর সেইদিনই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। সাহেব তখন জহরকে ইন্‌স্‌পেকটর করিবার সুপারিশ লিখিতেছিল। জহর সাহেবকে পদত্যাগ পত্র দিল। সাহেব পরম বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া জহরের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল কি এক প্রসন্ন দৃঢ়তা তাহার মুখে দীপ্তি পাইতেছে।

আমার ডাক্তারী

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া রেলির পাটগুদামে সামান্য কেরাণীর কার্য্যে জীবনটাকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম। বেলা দশটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খাটিয়া কুড়িটি টাকা মাসে উপার্জ্জন করিতাম; তাহাতে বুভুক্ষু উদর কখনো আমায় আশীর্ব্বাদ করে নাই।

একটা মতলব মাথায় আসিল, ডাক্তারী করিলে হয় না! দেশে পাড়াগাঁয়ে ১০।১৫টা শিশিতে বিবিধ বর্ণের কটু, তিক্ত, কষায় জল ভরিয়া যদি ব্যবসা করি তবে মাসে ত্রিশটা টাকাও কি উপার্জ্জন করিতে পারিব না! উপার্জ্জনে দশটা টাকা বৃদ্ধি হইলে উদর দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ সুনিশ্চয়, এবং দাস্যমুক্ত মনের প্রফুল্লতা অবশ্যম্ভব।

দুই একখানা বাংলা ইংরাজী বই ক্রমে ক্রমে কিনিয়া পড়িতে লাগিলাম। যখন খান চার পাঁচ বই সংগ্রহ করিলাম তখন স্থির করিলাম, ডাক্তারী বিদ্যায় যথেষ্ট পরিপক্ক হইয়াছি। দাস্যবৃত্তি আর না।

চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। পুঁজি গোটাকত বর্ণগর্ভ শিশি, একটা চোঙ, আর একটা জ্বরের কাঠি—যাহাকে সহরে লোকে বলে থার্ম্মোমিটার।

আমাকে কেউ শক্ত পীড়া চিকিৎসার জন্য ডাকে না। এদিকে মাথাধরা, পেটকামড়ানি, দাদ, চুলকণা প্রভৃতি ব্যারাম নামের কলঙ্ক ব্যারামকুলাধমদিগের চিকিৎসা আমার ভালো লাগে না।

একমাস কাটিয়া গেল। সে মাসে উপার্জ্জন করিলাম তিন টাকা তের আনা তিন পয়সা। মা কাঁদিলেন, গৃহিণী তর্জ্জন করিলেন, উদর বাপান্ত করিলেন, আমার বিবাহলব্ধ চেনছড়া বাঁধা পড়িলেন।

তখন এক বন্ধুর পরামর্শে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার বন্ধুবর নাকি একমাত্র নক্সভমিকা দিয়া ৪৫৬ রকম রোগ ভালো করিয়াছেন। আমি এহেন গুণবতী নক্স-ভমিকার প্রেমে মুগ্ধ হইব আশ্চর্য্য কি? নক্সভমিকাকে বরণ করিয়া গৃহে আনিলাম; সেকালের রাজরাণীদের মতো নক্সভমিকা শত সহচরী সঙ্গে আমার অন্তঃপুর আলো করিয়া বসিলেন। বলিতে লজ্জা নাই, বন্ধুবরের মতো আমার একাগ্র, একনিষ্ঠ প্রেম ছিল না; আমি পুরাকালের রাজাদের মতো রাণীর সঙ্গে দাসীদের প্রতিও মনোযোগ দিতে লাগিলাম। দেখিলাম প্রেয়সী এলোপ্যাথি অপেক্ষা হোমিওপ্যাথির অনেক সুবিধা—৫।৭টা ঔষধ লইয়া মিকশ্চার, পিল, পেষ্ট, প্লাষ্টার করার হাঙ্গামা কিছুই নাই। একটা ঔষধ লইয়া টুপ করিয়া একটি ফোঁটা ফেলি, শিশিতে পড়ুক না পড়ুক আমি খালাস। সুয়োরাণী হোমিওপ্যাথি দুয়োরাণীকে ক্রমশ দূর করিতে লাগিল। সুয়োরাণীর সুযোগ অনেক, বই খুলি আর চিকিৎসা করি। সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া লোকদের শুনাইয়া দি স্বয়ং ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারও বই দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন! হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কি যেমন তেমন!

যাহোক সুয়োরাণীর পয় ভালো। তৃতীয় মাসে আমি উপার্জ্জন করিলাম বত্রিশ টাকা সাড়ে বারো আনা।

বই দেখিয়া চিকিৎসাটা চলিতে লাগিল ভালোই। কিন্তু যখন

মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে সিম্ফিসিস্ পিউবিস্, অস্ অক্সিজিস, সুপ্রাঅরবিটাল রিজান, ফেমোর বোন, ফিফথ্ পেয়ার অব নর্ভস্ প্রভৃতি পৈশাচিক ভাষার সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন চেম্বার্সের ডিক্সনরীও আমাকে কোনো হদিস বলিয়া দিত না; তখন আমি হতাশ হইতাম।

যা হোক কোনো রকমে পসারটা জমিয়া গেল। আগেই ত বলিয়াছি যে সুয়োরাণীর পয় ভাল। দু তিন বৎসরে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিলাম—উদর দেবতা যে পরিতুষ্ট তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিব্য এই ভুঁড়িটি।

গেঁয়ো লোকের মতো গেঁয়ো রোগগুলোও বেশ নিরীহ রকমের। দু তিন বৎসরের চিকিৎসা ব্যবসায়ে কেহই ত মরিল না। শাস্ত্রে বলে 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ'; যখন মনে করিতাম যে আমি 'একমারী'ও নহি, এবং কখনো পাঁচমারীতেও বেড়াইতে যাই নাই, তখন গভীর খেদে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত। হায়! কবে একটা রোগী আমার হাতে মরিবে!

অবশেষে—হ্যাঁ, অবশেষে আমার সুযোগ আসিল। এক বৃদ্ধ দম্পতীর সবে ধন নীলমণি, বৃহৎ পরিবারের একমাত্র অন্নগ্রাস একটি যুবকের জ্বর হইল। চিকিৎসার্থ আহূত হইলাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত আমি।

একোনাইট, ইপিকাক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি আমার বাক্সস্থ সকল ঔষধগুলি লইয়াই নানাবিধ কসরৎ করিতে লাগিলাম। আট দিন গেল তবু জ্বর ছাড়িল না। নবম দিনে দেখিলাম নাড়ী দুষ্প্রাপ্য—কিন্তু রোগী বলিল আমি ভালো আছি। আমার সাহস, রোগীর আশ্বাস, ভীত জনকজননীকে কিন্তু

নিশ্চিন্ত করিতে পারিল না; তাঁহারা অন্য ডাক্তার ডাকিলেন। দশম দিনের সন্ধ্যাকালে রোগী হাসিয়া বলিল "হাঃ হাঃ হাঃ আমি ভালো হইলাম।" বৃদ্ধা বৃদ্ধ কাঁদিয়া বলিল "নীলমণি, বাপ কোথা যাস!" ছোট ছোট ভাইবোনগুলি অস্ফুট কলরব করিয়া উঠিল, রোগীর স্ত্রী আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল "ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!" রোগীর উন্মুক্ত চক্ষু বিকশিত দন্ত ঢাকিতে না ঢাকিতে রোগী মরিয়া গেল।

হায় হায়, এ কি হইল! তাহার মৃত্যু যেন আমাকে পাইয়া বসিল। বাতাসে শুনি সেই হাসি, 'হা হা হা'। গঙ্গার জল ছলক ছলক করিয়া বলে 'নীলমণি বাপ কোথায় যাস।' পাখীর কাকলীতে শিশুগুলির করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাই। 'বউ কথা ক'ও' ডাকে, আমি চমকিয়া শুনি 'ওগো কি হ'ল!' আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই দীপ্তদৃষ্টি বিকশিতদশন সর্ব্বদা আমাকে বিভীষিকা দেখায়! মৃত্যু এমন ভীষণ আগে কি জানিতাম!

আমি বৃদ্ধ বৃদ্ধার দিকে চাহিতে পারি না, মনে হয় তাঁহাদের কাতরদৃষ্টি আমাকে ধিক্কার দিতেছে। তাঁহাদের কাহাকে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহারা আমার পরিচয় দিতেছেন 'ঐ খুনে!' লজ্জায় সঙ্কোচে আমি অস্থির হইলাম; লোকের মুখের দিকে চাহিতে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তাঁহারা আমায় দেখিয়া হাসিয়া সস্নেহস্বরে কুশলপ্রশ্ন করিলে আমার উপহাস বলিয়া বোধ হইত, কান্না আসিত। মনে কেমন সদা সর্ব্বদা একটা অশান্তির ভাব জড়াইয়া ধরিতে লাগিল, অস্বস্তিতে প্রাণ জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

খুনে হত্যাকারী কী নরকযন্ত্রণা ভোগ করে তাহার আভাস

কিছু বুঝিতে পারিলাম। বিশ্বচরাচর যেন ষড়যন্ত্র করিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে থাকে 'ঐ খুনে! ওগো ঐ খুনে!' আর সেই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে করুণ প্রশ্ন উঠিতে থাকে 'আমি খুনে? ওগো আমি কি খুনে?'

আমি ডাক্তারী ছাড়িয়া আবার রেলির পাটগুদামে চাকরী লইয়াছি; কিন্তু এখনো আমার স্বস্তি নাই। ডাক্তারী আমলে গৃহিণী দু'খানা গহনা, মা দু'টা ব্রত করিয়া লোভী হইয়াছেন, তাঁহাদের অসন্তোষ কাংস্য-ঘণ্টার মতো সর্ব্বদাই আমার শ্রবণ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছে। এবং এখনো সেই যুবকের মৃত্যুর ধিক্কার আমার অন্তর বিমথিত করিয়া দিতেছে!

সাগর-সঙ্গম

কাশীনাথ বলবন্ত দীন ব্রাহ্মণ। তাঁহার পরিবারে কেবলমাত্র তাঁহার দুটি কন্যা, অম্বা ও অপ্পা। অম্বার বয়স ১৫ বৎসর, অপ্পা ১০ বৎসরের বালিকা। মাতৃহীনা কন্যা অম্বা অল্প বয়সেই গৃহিণীপদ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কিছু ম্রিয়মাণ, গম্ভীর, মিতবাক্। আর অপ্পা বসন্তের প্রজাপতিটির মতো সদা নর্ত্তনশীলা, চঞ্চলা, কারণে অকারণে হাস্য-মুখরা।

কাশীনাথের বাস বোম্বাই সহরের কয়েকক্রোশ দূরস্থ একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে। সমুদ্রের তরঙ্গ-আস্ফালন কুটীরের গবাক্ষ হইতে দেখা যাইত। অম্বা সেই সমুদ্রের মতোই গম্ভীর, স্তব্ধ, গভীর; আর অপ্পা সমুদ্রেরই মতো চঞ্চল, উদ্দাম, পরিবর্ত্তনশীলা।

তাহাদের প্রতিবেশী গোপালকৃষ্ণ সচ্ছল গৃহস্থের পুত্র। গোপালকৃষ্ণ সুগঠিতপেশী বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ যুবক। মিতবাক্। আকারে তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, একনিষ্ঠতা, সাহস ও বল স্পষ্টভাবে ফুটিয়া রহিত। গ্রামে বিদ্বান ও সচ্চরিত্র বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল।

কাশীনাথ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, গোপালকৃষ্ণের সহিত অম্বার বিবাহ দিবেন। এ প্রস্তাব গোপালকৃষ্ণের পরিবারেও অনুমোদিত হইয়াছিল; গোপালকৃষ্ণ এবং অম্বাও ইহা শুনিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে লজ্জায় উভয়ের গৌরগণ্ডে গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠিত না; চক্ষু অবনত হইয়া পড়িত না। উভয়ে আবশ্যক হইলে কথাবার্ত্তা কহিত, অন্য লোকের সম্মুখে একে অপরের নামোল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত বা কুণ্ঠিত হইত না। উভয়ের নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইলেও কোনো দিন কাহারও মুখ হইতে কোনো প্রণয়গর্ভ বাণী স্খলিত হইত না। প্রতিবেশিগণ বলাবলি করিত, এ বিবাহ উহাদের কল্যাণকর হইবে না; বিবাহ-প্রস্তাব পুরাতন হইয়া গেল, উভয়ের মধ্যে প্রেমসঞ্চার হইল কই?

অপ্পা বড় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। চঞ্চলা বালিকা অপ্পা পীড়ার যন্ত্রণা মোটেই সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। বড় ছট্‌ফট্ করে, বড় এলোমেলো বকে। বৃদ্ধ কাশীনাথ কাঁদিয়াই আকুল। অম্বা মাতার মতো শিয়রে বসিয়া সেবা করে, পীড়িতাকে শান্তি, স্বস্তি দিবার চেষ্টা করে। ভিষক, রোজা, মন্ত্র, কিছুতেই রোগের শান্তি নাই। প্রতিবেশী সকলে স্থির করিলেন মুম্বাদেবীর কোপ হইয়াছে।

যাঁহার নামে বোম্বাই সহরের নাম, সেই মুম্বাদেবী সমুদ্রবক্ষে

একটি শৈলদ্বীপের শিখরে মন্দিরাধিষ্ঠিতা। তাঁহার কোপশান্তির জন্ম পূজা অর্চ্চনা হইতে লাগিল। সকলের মনে হইতে লাগিল দেবীর অর্ঘ্য শিরে দিলে রোগযাতনার যেন অনেকটা উপশম হয়।

ঘোর বর্ষা; বাদল ও ঝড়ে সমস্ত বিশ্ব ওলট পালট করিতেছে। ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ সাগরতরঙ্গ ভীষণ আস্ফালনে তটে প্রহত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। বৃষ্টি, ঝড় ও সাগরের গর্জ্জন মিলিত হইয়া প্রলয় কল্পনা করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। রাত্রি প্রায় বারোটা, ভীষণ অন্ধকার। অপ্পার রোগ-পরাক্রম আজ বড় বেশি বর্দ্ধিত হইয়াছে। অম্বা ভীতা হইয়া কহিল, "বাবা, কাহাকেও ডাকিয়া আনি; তবু মানুষ কাছে থাকিলে সাহস থাকে।" অম্বা বড় প্রবীণার মতো কথা কহে। কাশীনাথ কহিলেন, "এই দুর্য্যোগে কেহ কি গৃহের বাহির হইবে?" অম্বা অতি সহজভাবেই বলিল, "কেহ না আসে গোপালকৃষ্ণ আসিবেই।" বৃদ্ধ নিরুত্তর। অম্বা একটা মোটা চট্ মাথায় দিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিঃস্ব কাশীনাথের সদ্‌গুণে গ্রাম বশীভূত ছিল। অম্বা এক বাড়ীতে খবর দেওয়াতে ক্ষুদ্র পল্লীময় সংবাদ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনেকে আসিলেন, অম্বাকে গোপালকৃষ্ণের বাড়ী পর্য্যন্ত আর যাইতে হইল না।

গ্রাম-বৃদ্ধেরা দেখিয়া স্থির করিলেন, দেবীকে পূজা দিয়া তুষ্ট করিতে পারিলে রক্ষা, নচেৎ মৃত্যু নিশ্চিত। অম্বার চোখ দিয়া জল পড়িল। সে বলিল, "অপ্পা তবে আর বাঁচিবে না। এ দুর্য্যোগে কি করিয়া দেবীকে পূজা দেওয়া সম্ভব হইবে?" অম্বা দেখিল জনতার পশ্চাৎ হইতে কে একজন বাহির হইয়া গেল।

অম্বাও সঙ্গে সঙ্গে একটা ছল করিয়া ঘরের বাহির হইয়া বরাবর সমুদ্রতীরের দিকে ছুটিল।

শুধু অন্ধকার, শুধু গর্জ্জন। বিদ্যুতালোকে একবার চোখে দেখার বেশি দেখা যায়, পরক্ষণে দ্বিগুণ অন্ধকার। অম্বা বহু কষ্টে দেখিল, একখানা নৌকা একজন মানুষ বুকে করিয়া মাতালের মতো মুম্বায় মন্দিরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অম্বাও একখানা নৌকা তরঙ্গের মাথায় তুলিয়া ভাসাইয়া দিল। বিদ্যুৎচমকে দেখিল, মুম্বাশৈল রাক্ষসের মতো দংষ্ট্রা বিকাশ করিয়া রহিয়াছে, একটা প্রচণ্ড তরঙ্গ পূর্ব্বগামী নৌকাখানাকে মাথায় তুলিয়া শৈলঅঙ্গে আছড়াইবার উদ্যোগ করিয়াছে। আবার অন্ধকার। আবার আলোক; নৌকার চিহ্নমাত্র নাই, লোকটি একটা প্রস্তর ধরিয়া ঝুলিতেছে। ঢেউ নামিয়া গিয়াছে, যখন আবার ফুলিয়া উঠিবে, তখন তাহার রূঢ় আলিঙ্গনে লোকটির কোনো সন্ধান থাকিবে না। ঢেউ ফুলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অম্বার নৌকা দোদুল্যমান লোকটির নিম্নে আসিল। অম্বা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিল, "গোপালকৃষ্ণ, হাত ছাড়িয়া নামিয়া পড়, আমি নৌকা লইয়া আসিয়াছি।" গোপালকৃষ্ণ নামিয়া পড়িল, অম্বা তাহাকে বাহুবেষ্টনে ধরিল, কিন্তু নৌকা পতনবেগ ও তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া উল্টিয়া গেল। নীরব প্রেমের অনাড়ম্বর মিলনক্ষণে নিবিড় আলিঙ্গনে মহাসমাধি!

অপ্পা সেই দিন হইতে ভালো হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু তাহার আর পূর্ব্বের উচ্ছল চাঞ্চল্য ও সদাপ্রফুল্লতা ফিরিল না। কিন্তু চিরদিনের নিকষে নীরব প্রেমের স্বর্ণ আভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মুক্তি

বোয়ার-যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহু বোয়ারবীরকে বন্দীভাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এইসকল অদম্য বীরের একটি দল পঞ্জাবের রাউলপিণ্ডি জেলার মারী তহসিলের অন্তর্গত কুকুল গ্রামে আবদ্ধ ছিল। ককুলগ্রাম এবটাবাদ হইতে তিন মাইল ও মারী সহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরে, সিন্ধুনদের শাখা সিরনের একটি ক্ষীণকায়া শাখা-নদীর উপর অবস্থিত। ককুল একটি সামান্য গ্রাম হইলেও প্রাকৃতিক শোভাসম্পদে নিতান্ত ঐশ্বর্য্যশালী। গ্রামের চতুর্দ্দিক অত্যুচ্চ পর্ব্বতপ্রাচীরে বেষ্টিত; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় নয়ন পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়াও শৈলগাত্রের শ্যামশোভা দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করে; গ্রামের এক বিঘা পরিমাণ জমিও সমতল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, সর্ব্বত্র উপলখণ্ড সবুজ তৃণশষ্পে আবৃত বা অল্পাবৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে তৃণ-পুষ্প ছোট ছোট কুচি শিশুর মতো সহাস-বিকশিত হইয়া বড় সুন্দর দেখায় সকলের চেয়ে সুন্দর সিরন-শাখা সেই খরতোয়া শীর্ণা স্রোতস্বতী; সে আঁকিয়া বাঁকিয়া, ফিরিয়া ঘুরিয়া গ্রামের পর গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া সিরনের উদ্দেশে ছুটিয়াছে। পাড়ে কত জাতীয় বৃক্ষ, কত সুন্দর পুষ্পপত্রশোভিত। মোটের উপর গ্রামখানি সনাতন ঋষি হিমালয়ের ক্রোড়ের মতো, শান্ত, নিশ্চল, কোলাহল ও সংগ্রামহীন; স্তব্ধ, সুগম্ভীর। এই গ্রামে আসিয়া বোয়ার বীরেরা মনে করিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা জন্মভূমি জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন ও বন্দী হইয়াছেন।

এই দলের মধ্যে একটি যুবক কিন্তু সর্ব্বদাই বড় বিষণ্ণ থাকিত। তাহার বয়স ২১।২২ বৎসর মাত্র; ক্ষীণ গুম্ফরেখা ও শ্মশ্রু-রাজির কৃষ্ণাভা তাহার কোমল কমনীয় মুখখানিকে অধিকতর সুন্দর করিয়াছিল। তাহার নাম গেব্রিয়েল। এজন্য সকলেই "মাই এঞ্জেল," "মাই ডিয়ার এঞ্জেল", "মাই ডার্লিং এঞ্জেল" ইত্যাদি বলিয়া সেই বালককে আদর করিয়া ডাকিত; ফলতঃ সে গেব্রিয়েল অপেক্ষা এঞ্জেল অর্থাৎ স্বর্গদূত নামেই অধিক পরিচিত ছিল। কুকুল ক্যাম্পের উচ্চ কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য আরদালী পর্য্যন্ত তাহাকে এঞ্জেল বলিয়া জানিত। এবটাবাদের বহুলোক ও নারীতেও কেহ কেহ তাহাকে ঐ নামে চিনিত।

বন্দীদিগের এবটাবাদের বাহিরে যাইবার অধিকার ছিল না। বন্দীগণ প্রায়ই দলে দলে এবটাবাদে বেড়াইতে যাইত; কেবল তাহাদের সঙ্গে যাইত না ঐ যুবক এঞ্জেল। বেলা পড়িয়া আসিলে, অস্তমান রবির সিন্দুরচ্ছটা যখন নদীজলে পড়িয়া আবির গুলিয়া হোলি খেলিত, তখন এঞ্জেল নদীর খরস্রোতে পড়িয়া খুব সাঁতার দিত; স্রোতের বিপরীত দিকে অবহেলে ছুটিয়া চলিত; অকর্ম্মা নরনারী পাড় হইতে সেই সন্তরণলীলা দেখিয়া বড় সুখানুভব করিত। এঞ্জেল সন্তরণে বিশেষ পটুত্ব দেখাইলে তীর হইতে খুব প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইত, কিন্তু তাহাতে বালকের বিষাদময় বদনে সন্তোষের একটি রেখাও অঙ্কিত হইতে দেখা যাইত না। সূর্য্য অস্ত যাইবামাত্র বালক তীরে উঠিত ও শীঘ্র শুষ্ক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া একক সঙ্গীহীন হইয়া এবটাবাদের দিকে চলিয়া যাইত। কেহ তাহার সঙ্গ লইলে সে আর যাইত না, ফিরিয়া

আসিত ; এবং সঙ্গ-বিমুক্ত হইলে আবার যাত্রা করিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে কোনো দিন ঐ সময়ে এবটাবাদে দেখে নাই ; কিন্তু কেহ কেহ তাহাকে এবটাবাদ সহরের বাহিরে নদীর ধারে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গলে ঐ সময়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

২

এবটাবাদ সহরের প্রান্তসীমায় একটি বাগান-ঘেরা ক্ষুদ্র দ্বিতল সুন্দর বাংলা আছে ; তাহার একধারে ককুল হইতে এবটাবাদ যাইবার সঙ্কীর্ণ বক্রগতি পার্ব্বত্য পথ, অপরধারে নদী। নদীর জলের ধার হইতেই বাড়ীটি উঠিয়াছে ; নদী হইতে বাড়ীটি সুন্দর একখানি ছবির মতো দেখায়। নদীর জল হইতে বাড়ীর নিম্নতলের ঘরের জানলা ৩।৪ হাত মাত্র উচ্চ। একজন টঙ্গা-ইনস্পেক্টার ষ্টান্‌লি সাহেব নূতন বিবাহ করিয়া বিলাত হইতে আসিয়া উক্ত বাংলাটি ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে। তাহার মেম সাহেবের নাম কি জানি না, সাহেব তাহাকে ফ্যানি বলিয়া ডাকে, হয় ত' সেটা সোহাগের নাম। যাহাই হোক, আমরাও তাহাকে সেই নামেই চিনিব।

ষ্টান্‌লির বয়স ৪৫।৪৬ ; কিন্তু ফ্যানির বয়স ২৫।২৬ বৎসরের বেশি হইবে না। ফ্যানি সুন্দরী বটে, কিন্তু তাহার বর্ণটা একটু ফ্যাকাশে, যেন সন্তরোগমুক্ত ; দেহ একটু কৃশ ; সে একটু অধিক বিলাসিনী।

ষ্টানলি-দম্পতি ভিন্ন সে বাড়ীতে একজন আয়া কিসমতিয়া, একজন খানসামা, একজন সহিস এবং একজন কোচ্‌ম্যান তসদ্দক

দিবারাত্রি বাস করিত। কিসমতিয়ার বয়স ৩০।৩২, যৌবনের ভগ্নচিহ্ন এখনো তাহার শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে; সে সাহেবের মেম আসার সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত হইয়াছে, এজন্য সে মেম সাহেবের খুব অনুরক্ত। কোঁচম্যান তসদ্দুক ষ্টানলির পুরাতন চাকর, সাহেবের চাকরী করিয়া সে চুল পাকাইয়াছে, বয়স ৫০।৫৫ হইবে। সে সাহেবের ভক্ত, বন্ধু, উপদেষ্টা। ষ্টানলি সাহেব স্বয়ং লোকটি বড় স্বল্পভাষী, স্থিরসংকল্প; এজন্য তাহাকে বড় রূঢ় বোধ হইত। তাহাকে সকলে ভয় করিত, সে কিন্তু নিজে কাহাকেও ভয় দেখাইবার জন্য কোনো অনুষ্ঠান করিত না। সে যাহা করিত, তাহা এমনি স্থির,অচঞ্চল ভাবে করিত যে, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না; কোনো কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সে কখনো কখনো স্বীয় কোচম্যানকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিত। কোচম্যান নিজের মত প্রকাশ করিয়া বলিত। তৎপরে তাহা গ্রাহ্য করা বা না করা সাহেবের ইচ্ছাধীন। এরূপ লোকের সহবাসে ফ্যানিও ভয়ে ভয়ে থাকিত। কখনো সে মনের মতো স্ফূর্ত্তি পাইয়া সুখী হইতে পারিল না।

ফ্যানির পাণ্ডুর মুখশ্রী রৌদ্রতপ্ত মৃণালের মতো ম্লান হইয়া পড়িতে লাগিল। সে সর্ব্বদাই অসুস্থ, সর্ব্বদাই উন্মনস্ক থাকে। যখন তাহার স্বামী বাড়ীতে না থাকে, তখন কিসমতিয়ার সঙ্গে খুব চুপি চুপি কি কথা হয়, পরামর্শ হয়, মুখে উদ্বেগ ও অধীরতা ফুটিয়া উঠে। আর যখন অন্য কেহ উপস্থিত থাকে, সে একটি কথাও কহে না, শয্যায় রুগ্নের ন্যায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। ফ্যানির অবস্থা দেখিয়া একদিন ষ্টানলি ডাক্তার ডাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ফ্যানি বলিল, "শীতের দেশ হইতে

হঠাৎ গরম দেশে আসিয়া আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হইতেছে। আমার মনে হয়, নীচের তলায় জলের ধারের ঘরে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, জলের হাওয়া লাগিয়া আমি সত্বর আরাম হইয়া উঠিতে পারিব।" সেই দিনই মেম সাহেবের শয়নকক্ষ জলের ধারে নির্দ্দিষ্ট হইল।

ষ্টানলি প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে টঙ্গার আড্ডা পরিদর্শন করিতে যায়, ফিরিতে রাত্রি ৯টা, ১০টা বাজে। সঙ্গে সঙ্গে থাকে কেবল মাত্র কোচম্যান তসদ্দুক।

একদিন, সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘন হইয়া উঠিয়াছে, সাহেব সেদিন সকাল সকাল বাড়ী ফিরিতেছে, তসদ্দুক তাহার পাশে বসিয়া টমটম হাঁকাইতেছে। সাহেব দেখিতে পাইল, নদীর জলের উপর, ফ্যানির জানালার নীচে একটা মাথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাহেব তসদ্দুককে গাড়ী থামাইতে বলিয়া ঐ মাথাটা লক্ষ্য করিতে বলিল। ক্ষণেক পরে ফ্যানির জানলা খুলিয়া গেল, কে একজন জল হইতে মাথা বাড়াইয়া দিল, দেখিতে দেখিতে সেই মাথাটা মানুষ হইল, এবং মানুষটা জানলা টপকাইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সাহেব বাড়ী গিয়াই আস্তে আস্তে ফ্যানির দরজা ঠেলিল, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সাহেব কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার গাড়ীতে উঠিয়া সহরে চলিয়া গেল ; এবং যথানিয়ম রাত্রি করিয়া গৃহে ফিরিয়া ফ্যানির দরজায় আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "May I come in darling ?" ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল "Ye-s।" সাহেব ঘরে ঢুকিয়া পত্নীর স্বাস্থ্যপ্রশ্ন করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে একটা তীক্ষ্ন সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিল, এবং নিঃশব্দে বিদায় লইয়া আপনার ঘরে প্রস্থান করিল।

ক্ষণেক পরে কিসমতিয়া আসিয়া ভয়চকিত স্বরে ফ্যানিকে বলিল,—"মেম সাহেব, খানসামারা বলাবলি করিতেছে যে সাহেব একবার সন্ধ্যার সময় বাংলায় আসিয়াই আবার চলিয়া গিয়াছিলেন।" ফ্যানির পাণ্ডুর মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল; সে অবাক নিস্পন্দভাবে একবার কিসমতিয়ার মুখের দিকে তাকাইল। সে দৃষ্টিতে শুধু ভীতি, শুধু নিরাশা! সে দৃষ্টি নিরুপায় ভাবে কিসমতিয়ার নিকট আশা ও আশ্বাস, সান্ত্বনা ও উপায় খুঁজিতেছিল।

তৎপরদিন সন্ধ্যাকালেও সাহেব পূর্ব্বদিনের ঘটনা লক্ষ্য করিল। কিন্তু তখনো তাহার বহিরবয়বে কোন চাঞ্চল্যলক্ষণ কেহ দেখিল না।

সেই দিন রাত্রে ষ্টানলি স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া একটু অধিক ক্ষণ স্ত্রীর ঘরে কাটাইল। সাহেব কথা কহিতেছিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ঘরের প্রতি কোণ, প্রতি অন্তরাল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিতেছিল। সাহেব কথায় কথায় বলিল, "আমি কাল দু'প্রহরে মারী যাত্রা করিব, টঙ্গার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, বড় লাট কাশ্মীর ভ্রমণে আসিতেছেন। আমি কাল যাইব, ফিরিতে ১০।১২ দিনের বেশি বিলম্ব হইবে না। তোমাকে অসুস্থ রাখিয়া যাইতেছি, আমার কাজ শেষ হইবা মাত্রই ছুটিয়া আসিতে হইবে। দরকার হয় আবার যাইব।"

ফ্যানি উৎসাহিত হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বড় লাট আসিবেন, তোমার ত আগে যাওয়াই উচিত। আমার জন্য কোন ভাবনা নাই; তুমি তাড়াতাড়ি করিয়া আসা যাওয়া করিলে তোমার কষ্ট হইবে; একেবারে সব কাজ শেষ করিয়া আসিলেই হইবে।" ষ্টানলি শুনিয়া শুধু মাথা নাড়িল, আর কোনো কথা হইল না।

তৎপরদিন প্রাতে প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া ষ্টানলি টমটমে চড়িয়া মারী অভিমুখে যাত্রা করিল। কিসমতিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল সাহেবের গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। তখন হাসিভরা মুখে ছুটিয়া গিয়া মেমসাহেবকে খবর দিল। মেম সাহেব আনন্দে বিকট চীৎকার করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল, বার দুই ওয়াল্‌ট্‌জ্‌ নাচিয়া লইল এবং নিপুণতার সহিত বেশবিন্যাসে মনঃসংযোগ করিল। আজ যেন ফ্যানির রুদ্ধ আনন্দ বন্ধনমুক্ত হইয়াছে, আজ যেন তাহার সকল অবসাদ দূরে গিয়াছে, এ যেন সে ফ্যানি নয়। আজ যেন তাহার কিসের উৎসব। তাহারই উদ্যোগ আয়োজনে উৎফুল্ল ব্যস্ততায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাংলা হইতে দূরে একখানা টমটমে দুইজন লোক বসিয়া একদৃষ্টে বাংলার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কি দেখিতেছিল,—গাড়ীতে কোনো আলো ছিল না। সেই সময় তেমনি একটা মাথা নদীর জলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে ফ্যানির জানলা খুলিয়া গেল; আজ ঘর অন্ধকার নয়, দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত; সেই দীপ্ত আলোকে জানলার নীচে নদীর জলও জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফ্যানি একটা মোটা দড়ি ফেলিয়া দিল, সেই মাথাটা জলের তল হইতে দু'খানি সুগঠিত হাত বাহির করিয়া তাহা ধরিল, যে রুগ্না ফ্যানির কথা বলিবারও শক্তি ছিল না সেই ফ্যানি এখন দুই হাতে একজন পুরুষকে টানিয়া ঘরে তুলিয়া লইল। আর তার পরেই সেই আলোকহীন টমটম নিঃশব্দে আসিয়া ষ্টানলির বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল।

কিসমতিয়া টমটম দেখিতে পাইয়া ফ্যানির গৃহাভিমুখে ছুটিল।

ষ্টানলিও টমটম হইতে এক লম্ফে নামিয়া, তিন লম্ফে যাইয়া বজ্র-মুষ্টিতে কিসমতিয়ার হাত ধরিয়া তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিল, এবং তারপর নিরুদ্বেগগতিতে অগ্রসর হইয়া ফ্যানির গৃহদ্বারে আঘাত করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে ফ্যানির তীক্ষ্ণমধুর কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে? কিসমতিয়া?". ষ্টানলি স্থির অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি ডার্লিং, দ্বার খোল।"

এই কথা শুনিবা মাত্র ফ্যানির কণ্ঠলগ্ন যুবক এক লম্ফে জানলার নিকট উপস্থিত হইয়াই যেন তাড়িতাহত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং নির্ব্বাকভাবে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ফ্যানিকে জানলা দেখাইয়া দিল। ফ্যানি জানলায় ছুটিয়া গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল কোচম্যান তসদ্দুক একটা গাড়ীর লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া নিষ্ঠুর নিয়তির মতো দাঁড়াইয়া আছে, আর তিনদিকঢাকা লণ্ঠনের আলোটা এক চক্ষু দৈত্যের বিশাল গোল নেত্রের মতো জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

ষ্টানলি দৃঢ়স্বরে বলিল "ফ্যানি, দরজা খুলিতে বড় অযথা বিলম্ব হইতেছে।"

ফ্যানির ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, অতিকষ্টে সে বলিল, "আজ আমার অসুখটা একটু বাড়িয়াছে, উঠিতে পারিতেছি না।"

"তবে থাক, তোমার উঠিয়া কাজ নাই, আমি দরজাটা ভাঙিয়া ফেলি।" ধড়াম্—দরজার উপর এক সজোর লাথি। দরজার খিল ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া গেল, ষ্টানলি ঘরের উজ্জ্বল আলোকে দেখিল একটা দেয়াল-আলমারীর কপাট তাড়াতাড়ি বন্ধ হইয়া গেল আর ফ্যানি মরণপাংশু মুখে সেই দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখিতেছে। ষ্টানলি কম্পমানা কিসমতিয়াকে পশ্চাতে করিয়া

ঘরে ঢুকিল। একখানা চেয়ারে বসিয়া ফ্যানির বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া নিরুৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার অসুখটা কি খুব বাড়িয়াছে ?"

ফ্যানির কণ্ঠ হইতে অতিকষ্টে উচ্চারিত হইল "হিঁ—ই।"

"ঘরে উজ্জ্বল আলোক তোমার ত সহ্য হয় না, আজ অসুখের দিনে এত আলো কেন ?"

ফ্যানি নিরুত্তর।

"ঘরে দরজা দেওয়াটাও ঠিক হয় নাই। দেখ ত তুমি উঠিতে পারিলে না, আমায় খিল ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিতে হইল।"

ফ্যানি নির্ব্বাক।

একটি সুন্দর ছোট আবলুস কাঠের ক্রুশের প্রতি ষ্টানলির নজর পড়িল। সে তাহা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল ক্রুশটির বাহুচতুষ্টয়ে সোনা দিয়া সূক্ষ্ম ও সুন্দর লতা ফুল অঙ্কিত, এবং নিম্নে সুন্দর ছাঁদের অক্ষরে 'জি' ও 'এইচ' এই দুইটি অক্ষর সোনা ও [illegible] সংমিশ্রণে বড় কারুময় করিয়া লেখা। ষ্টানলি জিজ্ঞাসা [illegible] "এ ক্রুশটা তুমি কোথায় পাইলে ?" ফ্যানি অতি কষ্টে উত্তর করি[illegible] "আজ একটা লোক ইহা বেচিতে আসিয়াছিল। আমার পছন্দ হওয়ায় আমি কিনিয়াছি।" ফ্যানি যেন গুরুশ্রমে হাঁপাইতেছিল ; তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ষ্টানলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ফ্যানি, আমার যেন বোধ হইল একজন কেহ ঐ আলমারীটার মধ্যে লুকাইয়াছে সে নিশ্চয় পুরুষ। স্ত্রীলোক হইলে লুকাইবার কোনো কার ছিল না।"

ফ্যানি এবার কষ্টে স্বষ্টে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করি

আহত অভিমানের ভাণের নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে সন্দেহ কর?" ফ্যানি আপনার হৃৎস্পন্দনে আলমারীর মধ্যে আর একজনের গুরু হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল।

ষ্টানলি বলিল, "সন্দেহ?—না, ঠিক সন্দেহ করি না, তবে যেন সেই রকম বোধ হইল। আচ্ছা, খুলিয়া দেখিলেই ত সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়।"

এবার ক্রোধে ফ্যানির কণ্ঠস্বর তীব্র হইয়া উঠিল; সে বলিল, "বেশ, দেখিতে পার; কিন্তু যদি কেহ না থাকে, তবে তোমায় আমায় এই পর্য্যন্তই শেষ।"

ষ্টানলি ফ্যানির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "দেখ, যদি ঐ আলমারীর মধ্যে কেহ না থাকে, তুমি তাহা হইলে আমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে, আর যদি কেহ থাকে, তাহা হইলেও আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব এই ক্রুশ ধর, শপথ করিয়া বল, যে, উহার মধ্যে কেহ নাই; আমি বিশ্বাস করিব।"

ফ্যানি আরামসূচক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, আর এক জনেরও তেমনি আরাম অনুভব করিল। ফ্যানি ক্রুশ লইয়া ধীরে স্থিরকণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিল, "যিনি এই ক্রুশে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে ঐ আলমারীর ভিতর কোনো লোক নাই।"

ষ্টানলি উঠিয়া কিসমতিয়াকে ডাকিয়া তসদ্দুককে ডাকিতে বলিল। তসদ্দুক আসিল। ষ্টানলি তাহাকে উচ্চস্বরে বলিল, "আমি আজ রাত্রেই মারী যাইব, টমটম ঠিক কর।" তৎপরে দরজার কাছে উঠিয়া গিয়া এক চোখ ঘরের দিকে রাখিয়া চুপি চুপি

কোচম্যানকে বলিল, "খানসামা প্রভৃতি বাড়ীর আর সকলে কি করিতেছে? তুমি তাহাদিগকে শুইতে যাইতে বল, আমাদের আহারের আবশ্যক নাই। আর তুমি দেখিও উহাদের মধ্যে কেহ যেন এদিকে না আসে।" তসদ্দুক "বহুৎখুব" বলিয়া চলিয়া গেল।

তৎপরে ষ্টানলি কিসমতিয়াকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "কিসমতিয়া, তুমি নিকা করিবে বলিয়াছিলে না? আসরফ মিস্ত্রী এখনো তোমায় নিকা করিতে রাজি আছে কি?"

কিসমতিয়া লজ্জা ও ভয়ে থতমত খাইয়া বলিল, "হাঁ, গরীব-পরবর।"

"তোমার নিকার খরচের জন্য তোমায় আমি এক হাজার টাকা দিব। তুমি যাও, চুপি চুপি, আর কেহ না টের পায়, তাহাকে তাহার হাতিয়ার সমেত এখানে সত্বর ডাকিয়া লইয়া এস। পারিবে?"

"আলবৎ, গরীব-পরবর।"

কিসমতিয়া চলিয়া গেল। ষ্টানলি আবার ঘরে যাইয়া চেয়ারে বসিল। ঘর নিঃঝুম। ঘণ্টাখানেক পরে কিসমতিয়া তাহার ভাবী স্বামী আসরফকে ডাকিয়া লইয়া আসিল। সাহেবের আদেশ অনুসারে কিসমতিয়া কয়েক ঝুড়ি ইট ও সিমেণ্ট আনিয়া দিল। মিস্ত্রী দেয়াল-আলমারীর সামনে প্রাচীর গাঁথিতে আরম্ভ করিল। সাহেব ঘরে পদচারণা করিতে লাগিল।

ফ্যানি ইসারা করিয়া কিসমতিয়াকে ডাকিল. সে আস্তে আস্তে আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। সাহেব যখন ঘরের অপর প্রান্তে, ফ্যানি তখন কাতরকণ্ঠে কিসমতিয়ার কানে কানে বলিল "কিসমতিয়া, পাঁচ শ টাকা, একটা ফুটো।" কিসমতিয়া মসলা জোগাইবার সময়

মিস্ত্রীর কানে কানে কথাটা বলিল। মিস্ত্রীও কর্ণিকের কোণের একটা ঠোকা দিয়া আলমারীর বসা কাচের দরজায় একটা মস্ত ফুটো করিয়া দিল। গাঁথুনি শেষ হইল, কাচের ফুটোর সম্মুখে দু'খানা ইঁটের মধ্যে একটু ফাঁক রহিয়া গেল। সাহেব তৎক্ষণাৎ হাজার টাকা দিয়া মিস্ত্রীকে বিদায় দিল। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে টমটমে চড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কিসমতিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী বহুদূর চলিয়া গিয়াছে।

ফ্যানি লাফাইয়া উঠিয়া কিসমতিয়ার দুইহাত ধরিয়া বলিল, 'আরো পাঁচ শ টাকা, মিস্ত্রীকে ফিরাইয়া আন।' কিসমতিয়া ছুটিল। ফ্যানি একটা শাবল লইয়া প্রাণপণ শক্তিতে গাঁথুনি ভাঙিতে লাগিল। একাগ্রমনে ফ্যানি কাঁচা গাঁথুনি ভাঙিতেছে, হঠাৎ পশ্চাতে কাহার বিকট হাস্যধ্বনি! শুনিয়া ফ্যানি চমকিয়া উঠিল, দেখিল পশ্চাতে স্বয়ং ষ্টানলি। ফ্যানির হাত হইতে শাবল খসিয়া পড়িল, ফ্যানি বসিয়া পড়িল। ষ্টানলি আবার হাসিয়া বলিল, "আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে পীড়িতা উত্থানশক্তিরহিতা ফ্যানি এখন কি করিতেছেন।"

কিসমতিয়া মিস্ত্রী লইয়া উপস্থিত, সাহেবকে সম্মুখে দেখিয়া উভয়ে একেবারে স্তম্ভিত। সাহেব তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, "মিস্ত্রী আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। দেয়ালটা ভালো গাঁথা হয় নাই বলিয়া আমি ভাঙিয়া ফেলিয়াছি, ছিদ্রমাত্রশূন্য করিয়া পুনরায় গাঁথিয়া দেও।" দেয়াল গাঁথা আবার শেষ হইয়া গেল।

সাহেব কিসমতিয়াকে বলিল, 'আমি মেমসাহেবের ঘরেই আজ থাকিব, তোমরা সব যাও।"

সাহেব ১৫।১৬ দিন সেই ঘর ত্যাগ করিয়া বাহির হইল না।

রুদ্ধ আলমারীর মধ্যে মৃত্যু-সংগ্রামের ব্যর্থ চেষ্টার আভাস পাইয়া সাহেব যখন হাসিত, তখন ফ্যানি জানু পাতিয়া করজোড়ে স্বামীর দয়া ভিক্ষা করিত। সাহেব বলিত, "তুমি ত ক্রাইষ্টের শপথ করিয়া বলিয়াছ, উহার মধ্যে কেহ নাই, আবার এখন ব্যাকুলতা কিসের!" ফ্যানির কাকুতি মিনতি, অশ্রুজল সব নিষ্ফল হইয়া গেল। প্রথম দুইদিন আলমারীর ভিতরে যে প্রবল উদ্ধার-লাভচেষ্টার আভাস পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ক্রমশ স্থির হইয়া আসিল। ফ্যানি এবার সত্য সত্যই শয্যা লইল। দিনের পর দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, পাণ্ডু হইতে পাণ্ডুরতর হইতে লাগিল। সাহেব ১৫।১৬ দিন পরে ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া মধ্যে মধ্যে ফ্যানিকে দেখিতেন ও তাহাকেও বিলাত যাইতে পরামর্শ দিতেন। ক্ষয়রোগের ঐ একমাত্র ঔষধ।

৩

এবটাবাদে ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পুলিশ থানায়, প্রত্যেক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে খোঁজ পড়িয়াছে, "১৬।১৭ দিন পূর্ব্বে ককুল ক্যাম্প হইতে গেব্রিয়েল হিটলী নামে একটি যুবক বোয়ার বন্দী পলায়ন করিয়াছে। তাহার দ্রব্যাদির মধ্যে একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে যে, সে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, যদি তাহাকে ৪।৫ দিনেও খুঁজিয়া না ধরা যায়, তবে বুঝিতে হইবে সে পলাইয়াছে।

"বন্দী খুব সম্ভব সাঁতার দিয়া সিরন নদী হইতে সিন্ধু নদে

পড়িয়াছে ও তথা. হইতে কোনোরূপে পলায়ন করিয়াছে। কারণ, দিন ১৫।১৬ পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে নদীতে সাঁতার দিতে দেখা গিয়াছিল, তাহার পর আর তীরে উঠিতে দেখা যায় নাই।

"বন্দীর পরিধানে সম্ভ্রমগোপযোগী সামান্য পরিচ্ছদ। সঙ্গে কিছুই লয় নাই; কেবল একটি আবলুশের ক্রশ সোনার কাজ করা পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ সেইটিই সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। তাহাতে সোনা ও রূপা দিয়া রোমান অক্ষরে তাহার নামের আদ্যক্ষর জি ও এইচ লেখা আছে। সে গেব্রিয়েল হিটলী অপেক্ষা এঞ্জেল নামেই অধিক পরিচিত ছিল।

"যে উহাকে ধরিয়া দিতে বা তাহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

তৎপরে বন্দীর চেহারা বর্ণনা করিয়া লেখা হইয়াছে যে "সে সম্ভ্রান্তবংশীয়, আকৃতিও তাহার বংশমর্য্যাদার পরিচায়ক।"

এবটাবাদ, মারী প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী সহরে সকলের মুখে আজকাল শুধু এই কথারই আলোচনা। আর বোয়ারেরা এঞ্জেলের এই মুক্তিতে বড় উল্লসিত।

ভুতের ঘটকালী

রমানাথ বাবু একটু উঁচু গলায় কড়া আওয়াজে বলিলেন, "সতীশ, তুমি আর আমাদের বাড়ী এসো না, বলে দিচ্ছি।"

সতীশ এই অপ্রত্যাশিত রূঢ় সম্ভাষণে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে?"

"আমা-দের বাড়ী আ-র তু-মি এসো না, বুঝলে?"

সতীশ অবাক হইয়া রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাপারখানা সে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না।

রমানাথ ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ করে চেয়ে রইলে যে? আমি ত না বোঝবার মতো কিছু বলিনি। আমা-র বা-ড়ী এ-স না—ব্যস।"

"আজ্ঞে আমার অপরাধটা শুনতে পাইনে?"

"শুনতে পাবে না কেন? শোন।—কারুর অজ্ঞাতে তার মেয়ের মন ভুলিয়ে নিজের প্রতি অনুরক্ত করাটা ভদ্রতার পরিচয় নয়। আর অভদ্র লোকের প্রবেশ আমার বাড়ীতে নিষেধ। বুঝলে?"

"আজ্ঞে নলিনীকে আমি বিয়ে করব বলেই"—

"আ-হা, তুমি ত বিয়ে করবে, কিন্তু আমি যে তার বাপ—আমি তোমার মতো একজন গরীবের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো কি না সে খবরটা নিয়েছিলে কি? আমার মেয়ের বিয়ে দেবো

একটা গরীবের সঙ্গে! ভালো তোমার আক্কেল! এখন শুন্‌লে ত যা শোনবার—এখন যাও।”

“একবার—”

“না না, একবার আধবার ওসব কিছু হবে টবে না। ওসব sentimental rubbish আমার কাছে নয়। নিজের ঘরে গিয়ে যত পার অভিনয় কর। এখন যাও, মেলা বকিও না।”

“আচ্ছা তবে আর একটা কথা বলুন। আমি যদি বড়লোক হ’তে পারি, তা হ’লে—”

“হাঁ হাঁ, তাতে আমার কিছু আপত্তি নেই। আগে তুমি বড়লোকই হও—একটা আলাদিনের প্রদীপ ট্রদীপের জোগাড় কর—তার পর সে হবে অখন। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত না তুমি আমার কন্যার যোগ্য হও ততদিন পর্য্যন্ত তুমি তাকে চিঠিও লিখবে না। প্রতিজ্ঞা কর।”—

সতীশ দুঃখে লজ্জায় অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া রমানাথের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

জগতের আলো তাহার চক্ষে নিভিয়া গেছে—বিশ্বছন্দ বেসুর বাজিয়াছে—সে চক্ষে আঁধার দেখিতেছিল, কানের মধ্যে শত ঝিল্লি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, হাজার যন্ত্রী একসঙ্গে হাজার করাতে হাজার উখা ঘষিতেছিল। সে ধীরে ধীরে অতি ধীরে পথ চলিতেছিল—কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানিতেছিল না। এমন করিয়া তাড়াইয়া দিল! ছি! ধিক জীবনে! এত অপমানের কারণ কি—না, আমি দরিদ্র! যেমন করিয়া পারি অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে। ধনবান হইয়া আমার নলিনীকে আমি সেই অর্থপিশাচের কাছ থেকে কাড়িয়া লইব তবে আমি মানুষ। এ অপমানের ঐ

প্রতিশোধ! হা ভগবান! নলিনীও কি আমাকে ত্যাগ করিল? এ কি সম্ভব? কত দিন যে সে আমার কাছে তাহার অন্তর উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে, সেখানে ত দেখিয়াছি শুধু প্রেম, শুধু বিশ্বাস, শুধু নিষ্ঠা। সে আমার! সে আমার! নলিনী আমার!

নিজের দুঃখদীর্ণ হৃদয়টাকে কোনও রকমে সান্ত্বনা দিবার জন্য সতীশ উত্তেজিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, "সে আমার! সে আমার! নলিনী আমার!"

কিছুক্ষণ পরেই তাহার অন্তর প্রণয়মত্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে সকল গ্লানি বিস্মৃত হইয়া নলিনীর প্রণয়স্মৃতির মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া তলাইয়া দিল।

২

"নলিদি, জ্যেঠা মশায়ের যখন সতীশ বাবুকে অপছন্দ তখন তুই ভাই তার জন্যে এমন করে শরীর ঢালছিস্ কেন?"

"কমল, মন ত আর শাসনের বশ নয়। আমি কি করব, আমি কিছুতেই মন বাঁধতে পারছি নে।"

"তবে কি তুই জ্যেঠা মশায়ের অবাধ্য হবি?"

"খানিকটা হব না, খানিকটা হব। আমি তাঁর মেয়ে—বাহ্যিক নিষেধ সব মেনে চলব; কিন্তু অন্তরটা আমার—সেখানে ত তাঁর শাসন চলবে না।"

"তবে কি তুই ছায়ার জন্যে জীবনপাত করবি?"

"কমল, তুই বলিস কি? ভালবাসতে শিখে অবধি যাকে ভালবাসছি, যে আমার জন্যে লাঞ্ছিত হ'য়ে গেল কমল, সে কি ছায়া? সে যদি ছায়া, তবে সত্যি কি কমল?"

"আচ্ছা, সতীশ বাবু ত গিয়ে অবধি কোনো খবরও দিলেন না!"

"বাবা চিঠি লিখতেও যে বারণ করে দিয়েছেন।"

এমন সময় নলিনীর ছোট ভাই সন্তোষ হাসিতে হাসিতে লাফাইয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল, "বড়দি, বড়দি, শুনেছ, সতীশ বাবু বিলেত যাচ্ছে।"

নলিনী অবাক হইয়া প্রশ্নব্যাকুল দৃষ্টিতে সন্তোষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বলিল, "তোকে কে বল্লে?"

"কে বলবে আবার—সতীশ বাবু বল্লে। আমরা ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম! দেখলুম বাগানের এক কোণে ঝোপের আড়ালে সতীশ বাবু একলাটি চুপটি করে বসে রয়েছে। আমি ছুটে গেলুম। তখন সতীশ বাবু আমায় বল্লে। সতীশ বাবু জাহাজের খালাসি হ'য়ে যাচ্ছে—সে বেশ মজা, ষ্টিমারের ভাড়া দিতে হবে না। সতীশ বাবু আমায় বল্লে—বড়দিকে বল্‌তে। বুঝলে বড়দি। বড়দি, বাবা কোথায়? বাবাকে বলে আসি।"

সন্তোষ উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া বাবার সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

নলিনী কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে নিজের গায়ের সকল অলঙ্কার আভরণ একে একে খুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

কমল বলিল, "ওকি নলিদি, ওসব খুলছিস কেন?"

নলিনী সজল চোখে কমলের দিকে চাহিয়া বলিল, "কমল, তিনি খালাসি হয়ে কোন অজানা দেশে অর্থের সন্ধানে যাচ্ছেন,—শুধু এই পোড়াকপালির জন্যে; আর আমি এইসব অনাবশ্যক ঐশ্বর্য্য ভোগ করব!"

"জ্যেঠামশায় দেখলে কি বল্‌বেন ?"

"যা খুসি বলবেন, আমি তাঁর অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকব সেই আমার মৃত্যুর অধিক। তার বেশি অপমান সহ্য করতে পারব না।"

"নলিদি, সতীশ বাবু যদি বড় লোক না হ'তে পারেন তা হলে কি হবে ভাই ! তা হলে ত জ্যেঠামশায় তোর অন্য জায়গায় বিয়ে দেবেন।"

"তার আগে মরব। মরা ত আমার হাতে।"

কমল সভয়ে নলিনীর হাত চাপিয়া বলিল, "না ভাই, তুই অমন কথা মুখে আনিস্ নি—আমার বড় ভয় করে।"

৩

অনেক কাল সতীশের আর কোনো খবরই পাওয়া যায় নাই। নলিনী বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোথায়ই বা সে সন্ধান করিবে, কেই বা তাহাকে সন্ধান দিবে ? তবু সে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া আছে।

বছর আড়াই পরে একদিন সকল খবরের কাগজে একটি ছোট প্যারাগ্রাফ পড়িয়া নলিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। সতীশচন্দ্র মজুমদার নামক একটি যুবক, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড পান করিয়া ইডেন গার্ডেনের এক নিভৃত কোণে আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই কি সতীশের বিলাতযাত্রা ? নলিনী এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। ঘন ঘন তাহার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

সেই দিনই বৈকাল বেলা একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে নলিনীকে বলিল, "আমার স্বামী সতীশ বাবুর বন্ধু। সতীশ বাবু আপনাকে একটা ঘড়ী

উপহার দিয়েছেন। আমার স্বামীর কাছে আছে। আপনি একজন লোক পাঠিয়ে সেটা আনিয়ে নেবেন। আর যদি আপনি বলেন, আমরা পাঠিয়ে দিতেও পারি।"

নলিনী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সতীশের উপহার! মৃত্যুকালেও তিনি আমাকে ভুলেন নাই! তাঁহার স্মৃতিটুকু আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আমি চিরজীবন তাহা রক্ষা করিব। কখনও তাঁহার প্রেমের অমর্য্যাদা করিব না—কখনও না, কখনও না।

নলিনী অপরিচিতাকে মিনতি করিয়া বলিল, "আপনাকে আমি বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আপনি দয়া করে যদি ঘড়ীটি নিয়ে আসেন ত আমার বড় উপকার হয়। বাবা টের পেলে আন্‌তে দেবেন না। কাল দুপুর বেলা—যখন বাবা বাড়ীতে থাক্‌বেন না, তখন যদি নিয়ে আসেন।" নলিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কমল চোখ মুছিতে লাগিল।

অশ্রু-আকুল মিনতিতে বাধ্য হইয়া অপরিচিতা ঘড়ীর দৌত্য স্বীকার করিয়া গেল।

৪

সতীশের উপহার সুন্দর একটি মার্ব্বেল পাথরের ক্লক ঘড়ী। বেশি বড় নয়। টেবিলের উপর বসানো যায়।

নলিনী ঘড়ীটিকে হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত প্রণয় দিয়া বরণ করিয়া লইল। আপনার শয়নকক্ষে শয্যার শিয়রে একটি মার্ব্বেলের ছোট গোল টেবিলের উপর সেটিকে রাখিয়া দিল। সে নিজহাতে নিত্য তাহার ধূলা ঝাড়ে, ফুল দিয়া সেটিকে সাজায়। ঘড়ীটি যে সতীশের শেষ উপহার!

নলিনী অবসর পাইলেই ঘড়ীটির কাছে গিয়া বসে। ঘড়ীর টিক টিক শব্দ, টুং টুাং বাজনা যেন কোন পরলোক হইতে সতীশের হৃৎস্পন্দন বহন করিয়া আনিয়া নলিনীকে শুনায়। রাত্রি হইলেই নলিনী আপনার ঘরে খিল দিয়া বসে—আর অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া ঘড়ীটি দেখে। বাড়ী নিশুতি—নলিনী ঘড়ীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল যেন সতীশ তাহাকে ডাকিয়া জাগাইতেছে—

"শুন নলিনী খোল গো আঁখি
এখনো ঘুম ভাঙিল না কি ?"

নলিনী মনে করিল স্বপ্ন। কিন্তু না, স্বপ্ন ত নয়! স্পষ্ট এযে সতীশের কণ্ঠ! সতীশ বলিতেছে—

"তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম বিজন-জীবন-বিহারী ?"

সে স্বরে কী প্রাণভরা প্রেম প্রতি শব্দের ভিতর দিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। কী করুণ মিনতি ভরে সতীশ বলিতেছে—

"ভালোবেসে সখি, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে!
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!"

কী প্রণয়-ব্যাকুল করুণ প্রার্থনা! সতীশ মরণের পারে গিয়াও নলিনীকে ভুলিতে পারে নাই! তাহার অতৃপ্ত প্রণয়ের

আকুল ক্রন্দন আজও নলিনীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। নলিনী ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল—ঘড়ীর ডালাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার উপর সতীশের আবছায়া মুখ ;—সেই ছায়ার মুখে তেমনি স্নিগ্ধ হাসি মাখানো, প্রণয়বিভোর চোখ দুটি তেমনি প্রশান্ত ; ছায়ার ভিতর হইতেও যেন প্রগাঢ় প্রণয় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া নলিনীর মন আনন্দে বিস্ময়ে ভয়ে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তার পর নিত্য রাত্রে নলিনী এইরূপ বাণী শুনিতে লাগিল। ভয়ও করে—কিন্তু না শুনিয়াও থাকা যায় না। নেশার মতো নলিনীকে এই ঘড়ীটি পাইয়া বসিল। ঘড়ীতে যেমন বারোটা বাজে অমনি মিনিট দশেকের জন্য সতীশের ছায়া করুণ কণ্ঠে প্রণয় নিবেদন করিয়া বিদায় লয়।

ক্রমে ক্রমে নলিনীর মন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে সদাই অন্যমনস্ক থাকে। থাকে থাকে চমকিয়া উঠে। তাহার দৃষ্টি উদাস। মুখ মলিন।

কমল দেখিয়া দেখিয়া এক দিন বলিল, "নলিদি, তোর হয়েছে কি ? দিন দিন যে শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছিস। এমন করে' শরীর ক'দিন বইবে ?"

"বইবে ঢের দিন। আমার আর কোনোও দুঃখ নেই, তিনি আমাকে এখনও তেমনি ভালোবাসেন।"

কমল হাসিয়া বলিল, "তুই আবার থিয়জফিষ্ট হলি কবে থেকে যে পরলোকের তত্ত্ব জানছিস্ ?"

"হাসি নয় কমল। সত্যি সত্যি। তিনি নিজ মুখে রোজ আমায় বলে যান।"

কমল নয়নদ্বয় যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা! বলিস কি দিদি!"

নলিনী বলিল, "সত্যি কমল। তিনি রোজ আমার সঙ্গে কথা বলেন।"

ভয়ে কমলের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুখ শুকাইয়া গেল।

নলিনী বলিল, "ভয় কি কমল! সে কণ্ঠস্বর তেমনি মিঠে, তেমনি আবেগভরা, তেমনি প্রণয়পূত। প্রথম প্রথম আমারও ভয় করত। কিন্তু এখন আর একটুও ভয় করে না। বরং তাঁর কথা না শুনে এখন থাকতে পারিনে। মনে হয় আর একটু যদি থাকেন। একবার যদি ভালো করে' বেশিক্ষণের জন্যে দেখা দেন!"

কমল অতিমাত্র ভীত হইয়া বলিল, "তবে কি অল্প করে' অল্প-ক্ষণের জন্যে দেখা দেন নাকি?"

"হ্যাঁ কমল, আবছায়া, শুধু সেই হাসিভরা মুখখানির ক্ষীণ আভাস দেখতে পাই।"

"দেখ নলিদি, তুই রাত্রে আর একলা থাকিসনে। তুই আমার ঘরে শুস।"

সে রাত্রে কমল জোর করিয়া নলিনীকে নিজের ঘরে শোয়াইল। প্রতীক্ষায় জাগরণে নলিনীর রজনী প্রভাত হইল, কিন্তু সে রাত্রে আর সতীশের প্রণয়বচন সে শুনিতে পাইল না।

কমল বলিল, "কৈ নলিদি, সতীশ বাবু ত কৈ কথা বললেন না। তুই নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিস।"

"না কমল। তিনি হয়ত তোর সামনে লজ্জায় আসতে পারেন নি। আমি আর তোর কাছে শোব না।"

নলিনী পুনরায় নিজের ঘরে শয়ন করিতে লাগিল, এবং প্রতি রাত্রে তেমনি করিয়া ঘড়ীর গায়ে সতীশের মুখ ফুটিয়া উঠে এবং কোথা হইতে তাহার কণ্ঠে প্রণয়শ্লোক ধ্বনিত হয়। নলিনী ভাবিল, "তিনি শুধু আমার এই ঘরটিতেই আসেন। এই ঘর আমার পরম তীর্থ।"

কমল যখন শুনিল যে সতীশের অশরীরী বাণী আবার শোনা যাইতেছে তখন এক দিন সে রমানাথ বাবুকে বলিল, "দেখ জ্যেঠামশায়, নলিদি রোজ রোজ সতীশ বাবুর ভূতের সঙ্গে কথা বলে।"

রমানাথ বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভূতের সঙ্গে কথা বলে কিরে? নলির সঙ্গে তুইও পাগল হলি না কি?"

"পাগলামি নয় জ্যেঠামশায়। নলিদি রোজ রোজ ভূতের কথা শোনে।"

রমানাথ হাসিয়া বলিলেন, "ওসব হিষ্টিরিয়ার খেয়াল।"

"খেয়াল নয় জ্যেঠামশায়। সত্যি সত্যি জেগে জেগেই শোনে।"

রমানাথ বলিলেন, "তোদের এত করে লেখাপড়া শেখালাম তবু তোরা ভূতের ভয় করিস। আজকাল থিয়জফিষ্ট ছাড়া অমন বোকা কেউ আছে তা ত জানতাম না।"

কমল একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমি ঠিক বিশ্বাস করিনে, কিন্তু নলিদি যেরকম করে' বলে—"

"ও! নলি বলে! তুই শুনিস নি ত? নলির কথায় তুই অমনি

বিশ্বাস করলি। দেখছিস্ ত তার মনের অবস্থা! নলিকে তুই একলা শুতে দিস্‌নে। তোর কাছে শোয়াস্।"

"এক দিন শুইয়েছিলাম। কিন্তু নলিদি শুতে রাজি নয়। সতীশ বাবুর ভুত লোকের সামনে আসে না—সেদিন রাত্রে আসে নি।"

"ওঃ হোঃ! লাজুক ভুত বটে! দেখলি কমলি, ওসব নলির মস্তিষ্কের আর স্নায়ুর দুর্ব্বলতা। আমি ডাক্তার মল্লিককে কল দেবো এখন। তুই কিন্তু রাত্রে নলির কাছে শুবি—বুঝ্লি।"

কমল স্বীকৃত হইয়া গেল। ডাক্তার মল্লিক আসিয়া nervine tonic ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। নলিনী কিন্তু কিছুতেই নিজের ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র শুইতে রাজি হইল না। অগত্যা কমলই নলিনীর ঘরে গিয়া শুইল, নলিনী ইহাতেও অনেক আপত্তি করিল; অনুনয় বিনয়, মিনতি ক্রন্দন, তর্জ্জন আস্ফালন, সব নিষ্ফল হইল, কমল কিছুতেই ঘর ছাড়িল না।

এইরূপ লড়ালড়ি করিতে করিতে রাত হইয়া গেছে। নলিনী ক্ষুণ্ণ মনে চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, কমলের অল্প তন্দ্রা আসিয়াছে। এমন সময় বারোটা বাজিল। আর অমনি সতীশের কণ্ঠ বলিয়া উঠিল—"শুন নলিনী খোল গো আঁখি।"

সে স্বর কমলের কানে গেল। কমল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া যাহা দেখিল ও শুনিল তাহাতেই তাহার চক্ষু স্থির। সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

নলিনী বলিল, "শুনলি কমল? এখন বিশ্বাস হয়?"

"বিশ্বাসের চোটে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে নলিদি! তুই ঐ ভুতুড়ে ঘড়ীটা ঘর থেকে বিদেয় করে দে। ঐটে এসে অবধি এই বিপদ আরম্ভ হয়েছে।"

"তা কি পারি কমলি, ওযে আমারই প্রভুর দান!"

সকাল হইবা মাত্রই কমল মুখখানি ভয়ানক ফ্যাকাশে ও লম্বা করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া রমানাথকে বলিল, "জ্যেঠামশায়, নলিদির কথা সব সত্যি! আমি কাল রাত্রে নলিদির ঘরে শুয়েছিলাম। ঠিক যেই বারোটা বাজল আর অমনি সতীশ বাবুর ছায়ামূর্ত্তি কথা কইতে লাগল—এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি!" .

রমানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হিষ্টিরিয়া এমনি সংক্রামক যে দুর্ব্বল স্নায়ুর লোক সহজেই আক্রান্ত হয়। তোকেও দেখছি রোগে ধরল!"

কমল একটু অভিমানমিশ্র বিরক্তির স্বরে বলিল, "বিশ্বাস হয় না। তুমি নিজে একদিন শুয়ে দেখনা ব্যাপারখানা কেমন।"

রমানাথ বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। আজই আমি নলির ঘরে শোবো। কিন্তু তুই নলিকে একথা বলিসনে।"

খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে রমানাথ নলিনীর ঘরে গিয়াই দরজায় খিল দিলেন। নলিনী কত কাকুতি মিনতি করিল, কাঁদিল, তবু রমানাথ দরজা খুলিলেন না।

কিন্তু সকালে রমানাথ যখন নলিনীর ঘর হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহার মুখের ভাব পরম উপভোগ্য, দেখিবার মতো,—লজ্জা বিস্ময় ভয় সন্দেহ সেখানে নিজের নিজের ছাপ রাখিয়া গেছে। কমল জিজ্ঞাসা করিল "জ্যেঠামশায় কেমন? ঠিক ভুত কি না?"

রমানাথ বলিল, "আরে রাম রাম! বড় বেয়াড়া বেহায়া ভুত! মেয়ের প্রণয়সম্ভাষণগুলো অক্লেশে কিনা বাপের কানে গুঞ্জন করে' গেল! আরে ছ্যা ছ্যা! আমি যত বলি ও সতীশ আমি—আমি নলিনী নই, নলিনীর বাবা রমানাথ? কে শোনে

সে কথা! সটান সব বেফাঁশ কথা আমার কানে বলে গেল। আরে ছ্যাঃ ?”

ভুতের আর কোনোই কিনারা হইল না। রমানাথের প্রতিবেশী মহেশ্বর বাবু থিয়জফিষ্ট, তিনি শুনিয়া বলিলেন, “ও সব astral body, fifth planeএ বিচরণ করে। মর্ত্যের কেউ খুব আবেগভরে তাদের চিন্তা করলে তারা মর্ত্যের লোককে clairvoyance দান করে, তাতে করে অশরীরী ছায়া দেখা যায়, কথাও শোনা আশ্চর্য্য নয়। এর তত্ত্ব মহাত্মারা সব জানেন। তবে দুঃখের বিষয় তাঁরা সব তিব্বতের দুর্গম গিরিগুহায় বাস করেন।”

৫

ভুতের উপদ্রব অপেক্ষা লোকের উপদ্রব রমানাথের অসহ্য হইয়া উঠিল। থিয়জফিষ্ট, রোজা, গুণী, খবরের কাগজের রিপোর্টার, কৌতুকদর্শী প্রভৃতির দিবারাত্র আনাগোনায় বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কেহ বলে গয়ায় পিণ্ড দেও, কেহ বলে সিন্নি মানো, কেহ বলে তিব্বতে মহাত্মার শরণাপন্ন হও গিয়া; কেহ বলে বাড়ীটা বেচিয়া ফেল, কেহ বলে শীঘ্র নলিনীর বিবাহ দিয়া দেও, কেহ বলে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যাও। হিতৈষীদের বিবিধ উপদেশের তাড়নায় রমানাথ ক্ষেপিয়া উঠিবার উপক্রম। আর এদিকে নলিনী দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। বিবাহের কথা বলিলে সে কাঁদে। আর ব্যাপার শুনিয়া ভুতের ভয়ে কোনো লোকই তাহাকে বিবাহ করিতেও রাজি হয় না।

রমানাথ বিরক্ত হইয়া একদিন বলিয়া উঠিলেন “আঃ কি কুকর্ম্মই করেছিলাম সতীশকে তাড়িয়ে। তাড়ালাম তাড়ালাম, হতভাগাটা

কিনা বিষ খেয়ে অপঘাতে মরে শেষে ভুত হল ! এসব উৎপাতের চেয়ে সতীশ জামাই হওয়া যে ঢের ভালো ছিল। এখন নলিনী যাকে বিয়ে করতে চাইবে তার সঙ্গেই বিয়ে দেবো—আর না বলছিনে। দেখ্ কমল, তোর কাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় বলে ফেল—"

কমল লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল। দেখিল সিঁড়িতে উঠিতেছে সতীশ !

কমল থতমত খাইয়া নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। একি! দিনের বেলা ভুতের আবির্ভাব !

সতীশ হাসিয়া বলিল, "কি কমল ! এতকাল পরে দেখা হল, হাসিমুখে অভ্যর্থনা না করে অমন করে' চেয়ে রইলে যে ?"

কমল সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "সতীশ বাবু !"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "কেন কমল, তাতে কোনো সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?"

কমল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তা হ'লে বেঁচে আছেন ?"

সতীশ হাসিমুখে উত্তর করিল, "সেই-রকমই ত মনে হচ্ছে। তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে নাকি ?"

"তা'হলে আপনি মরেন নি !"

"বেঁচে যখন আছি, তখন আর মরা হয়ে ওঠে নি।"

"আপনি ভুত নন !"

"আপাততঃ বর্ত্তমান !"

"যাক, তা'হলে বাঁচা গেল। আপনি তা হলে যমের বাড়ীর ফেরত নন।"

"না, আপাততঃ বিলেত ফেরত সিভিলিয়ান। কিন্তু হঠাৎ

যমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সম্ভাবনাটা মনে উদয় হল কেন ?”

“অনেক দিন আপনার খবর পাওয়া যায় নি। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে দেখা গেল, একজন কে সতীশ মজুমদার বিষ খেয়ে ইডেন গার্ডেনে মরেছে। তেমন মরণ আপনার মতো কবি ব্যর্থপ্রণয়ীরই উপযুক্ত মনে করে আমরা ঠিক করলাম সে ব্যক্তি আপনিই। তারপর সেই দিনই আপনার উপহার এক ভুতুড়ে ঘড়ী এসে হাজির। সেটার ভিতর আপনার চেহারা আর স্বর—সে এক বিষম ভুতুড়ে কাণ্ড। মণিলাল বাবুও এমন ভুতুড়ে কাণ্ড দেখেন নি।”

সতীশ “ওহো” করিয়া খুব হাসিতে লাগিল। খানিক হাসির পর বলিল, “তোমার জ্যেঠামশায় আমাকে চিঠি লিখতে পর্য্যন্ত বারণ করেছিলেন। তাই বিলেতে গিয়ে অনেক খরচ করে ঐ ঘড়ীটি তৈরি করাই। ঠিক বারোটা রাত্রে ঘড়ীর ডালার পেছনে একটা বিদ্যুতের আলো জ্বলে ওঠে আর ওর সঙ্গে ফনোগ্রাফ বেজে ওঠে। ঘড়ীর ডালায় হাল্কা রঙে আমার মুখ আঁকা আর ফনোগ্রাফে আমার কণ্ঠ ধরা। নলিনীকে সান্ত্বনা দেবার এই একটা ফন্দি অনেক ভেবে বের করেছিলুম। এ দেখছি হিত করতে বিপরীত হয়ে গেছে, আমি মরে গেছি মনে করে নলিনী বিয়ে করেনি ত ?”

“বিয়ে ? সহমরণে যেতে বসেছে। ঐ নলিদি আসছে। সতীশ বাবু, আপনি একটু আড়ালে যান, হঠাৎ আপনাকে দেখলে মুস্কিল হবে।”

পাশের ঘর হইতে নলিনী বাহিরে আসিয়া সতীশের হাত

ধরিল। অশ্রুপরিম্লান চোখদুটি সতীশের মুখের উপর সতৃষ্ণভাবে রাখিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "চল বাবাকে প্রণাম করে আসি।"

অন্ন-সংস্থান

রামচরণ এটর্ণি-আপিসের নকলনবিশ। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর একই আপিসে কাজ করিয়া রামচরণ এখন বৃদ্ধ হইয়াছে। তাহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। বয়সের অনুপাতেও সে একটু অধিক স্থবির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার শরীর লোল, কেশ শুভ্র, স্নায়ু দুর্ব্বল, শক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবু তাহাকে চাকরি করিতে হইতেছিল,—চাকরী না করিলে খাইবে কি? বাড়ীতে তাহার স্ত্রী, দুটি মেয়ে প্রায় বিবাহযোগ্য, আর তিনটি ছোট ছোট ছেলে। পঁয়ত্রিশটি মাত্র টাকা সে বেতন পায়, তাহাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে। চাকরি ছাড়িয়া দিলে এতগুলি মুখের অন্ন-সংস্থানের আর কোনো উপায় ছিল না।

একদিন রামচরণ আপিসে গিয়া আপনার ভাঙা চেয়ারখানি টানিয়া মসিমলিন টেবিলের সম্মুখে বসিতে যাইতেছে, এমন সময় মেধো উড়ে আসিয়া বলিল "মুখুয্যে বাবু, বাবু আপনাঙ্ক ডাকুচি।"

রামচরণ তাড়াতাড়ি বাবুর পর্দ্দাঘেরা কামরার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার দেহ ঈষৎ নত, মস্তক ঈষৎ কম্পিত, গতি চেষ্টা সত্ত্বেও মন্থর।

বাবুর সম্মুখে গিয়া রামচরণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বাবু গম্ভীর স্বরে বলিল "দেখ মুখুয্যে, এ রকম হলে তোমার আর এখানে চাকরি করা চলবে না। এ কি করেছ তোমার মাথা-মুণ্ডু দেখ তো।" বলিয়া একতাড়া কাগজ মুখুয্যের সামনে ফেলিয়া দিল।

মুখুয্যের হাত ঠক্‌ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল, মাথা নড়িতেছিল। যথাসম্ভব সত্বর চাপকানের পকেট হইতে একটা দড়িবাঁধা চশমা বাহির করিয়া পরিয়া কাগজের তাড়া হাতে উঠাইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। এই দলিলটা সে কালই নকল করিয়াছে, কিন্তু হায় হায় আগাগোড়াই ভুল হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাক মিনতিভরা দৃষ্টিতে মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া রামচরণ নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইল।

এটর্ণি বাবু বলিল "যাও, ফের এটা নকল করে দেও। কিন্তু বলে দিচ্ছি এরকম হলে তোমার এখানে চলবে না। যত বুড়ো হচ্চ তত যেন লেখা পাকচে—লাইন ব্যাঁকা, লেখা টেরা, ছাড়, ভুল,—এসব কি।"

রামচরণ কিছু না বলিয়া কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার জায়গায় ফিরিয়া আসিল। সে অনুভব করিতেছিল আপিসের সকলের দৃষ্টি তাহার দিকেই লক্ষ্য পাতিয়া আছে।

রামচরণ বেশ ধরিয়া ধরিয়া যত লিখিতে চেষ্টা করে, খারাপ না হয় যত ইচ্ছা করে, হাত ততই কাঁপিয়া যায়, মন ততই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। অনেক কষ্টে সমস্ত দিন খাটিয়া রামচরণ নকল শেষ করিল। তারপর দুর্গানাম জপ করিতে করিতে

কাঁপিতে কাঁপিতে বাবুকে নথি দিতে গেল। বাবু এপাতা সেপাতা উল্টাইয়া চোখ দুটা বড় রূঢ় রকমে পাকাইয়া বলিল "এদিকে এস, দেখসে।" মুখুয্যে ঘুরিয়া বাবুর পাশে গিয়া এক হাতে ভাঙা চশমার ডাঁটিটা ধরিয়া কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। বাবু বলিল "এ সব কি ?"

রামচরণ দেখিল লেখা অতি কদর্য্য হইয়াছে। হরপগুলা বাঁকিয়া গিয়াছে, দুর্ব্বল হাত লাইন সোজা রাখিতে পারে নাই, ক্ষীণ স্মৃতি বহুস্থানে ছাড়িয়া ভুল করিয়া অনর্থ বাধাইয়াছে। বার্দ্ধক্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া রামচরণের বলিবার আর কিছু ছিল না।

বাবু বলিল "যাও, একাজ তোমায় দিয়ে আর হবে না দেখছি। এটা বটুকে নকল করতে দেও, আর এর মজুরি তোমার মাইনে থেকে কেটে দেওয়া হবে। বুঝলে ?—"

রামচরণের সদাকম্পমান শির আর একটু অধিক কম্পিত হইল। সে নীরবে চলিয়া যাইতেছিল। বাবু বলিল "শোনো।" আবার সে ফিরিয়া আসিল। "এই চিঠি কখান নকল করে নিয়ে এস। দেখো যেন ভুল না হয়। বার বার তিনবার। এবার ভুল হলে তোমায় বরখাস্ত করব নিশ্চয়। আমার কাছে কাজের খাতির। যতক্ষণ তুমি কাজ করতে পারবে ততক্ষণ তুমি বাপের ঠাকুর, নইলে তুমি ভেড়ের ভেড়ে। বুঝলে ? এই বুঝে কাজ কোরো।"

ইহার উত্তরে রামচরণ কোনো কথাই বলিতে পারিল না। কাগজের তাড়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল। রামচরণ ভাবিতে লাগিল, "কাল বাবুকে একটা দরখাস্ত করিতে

হইবে—ত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে বাবুর বাপের আমল থেকে কাজ করিতেছি, বৃদ্ধ বয়সে আমাকে যদি কিছু পেন্সন বা এককালীন পারিতোষিক দিয়া বিদায় দেন। আজকে নাজানি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি—দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটিলে বাঁচি। যদি চাকরি যায়? তাহা হইলে একেবারে নিরুপায়—ভবিষ্যৎ বড় কালো অন্ধকারে আবৃত—ছেলেপেলেগুলি না খাইয়া মারা যাইবে।" রামচরণের জরাক্ষীণ দৃষ্টি অশ্রুময় হইয়া আরো ঝাপ্সা হইয়া উঠিল।

এই রকম চিন্তা উদ্বেগের মধ্যে নিজেকে প্রতিপদে সামলাইয়া রামচরণ চিঠি কখানির নকল শেষ করিল। দু'তিনবার করিয়া পড়িয়া দেখিল ঠিক আছে। তখন সাহস করিয়া বাবুর কাছে গেল।

বাবু চিঠিগুলা হাতে করিয়াই চোখ রাঙাইয়া বলিল "আজ তুমি মদ খেয়েছ নাকি? এ কী হয়েছে?" রামচরণ সবিস্ময়ে দেখিল সকল চিঠিগুলির নীচে লিখিয়াছে—আপনার চিরানুগত ভৃত্য রামচরণ মুখুযো। এবং খামের উপর লিখিয়াছে—বাবু সদয়চন্দ্র শীল, এটর্ণি। এটর্ণিবাবুকে দরখাস্ত করিবার কথা ভাবিতে ভাবিতে রামচরণের ব্যাকুল মস্তিষ্ক নিজেরই নাম ও এটর্ণি বাবুরই ঠিকানা লিখিয়া ফেলিয়াছে। বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিল "মেধো, খাজাঞ্চিবাবুকে ডাক্ ত।"

মেধোকে ডাকিতে হইল না। খাজাঞ্চি বাবু স্বয়ং সেই বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়া ত্রস্ত ভাবে কামরার মধ্যে গেল। এটর্ণি বাবু বলিল, "দেখুন জ্ঞান বাবু, মুখুয্যের আজ পর্য্যন্ত মাইনে চুকিয়ে দিন। আর এক মাসের মাইনে আগাম দিয়ে দিন নোটিশের পরিবর্ত্তে।"

মুখুয্যের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। এটর্ণিবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিল "হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে—খাজাঞ্চির কাছ থেকে মাইনে পত্র চুকিয়ে নিয়ে বাড়ী যাও। ঢের চাকরি করেছ—এখন মরবার আগে দিনকতক বিশ্রাম করগে। তোমার কাছে যে সব কাগজপত্তর আছে সব বটুকে বুঝিয়ে দিয়ে যেও।"

রামচরণ অনেক চেষ্টায় একটি ক্ষীণ স্বর বাহির করিয়া বলিল "আমি হুজুরের বাপের আমলের চাকর—আমায় ক্ষমা করুন।"

"এক আধ দিন হলে চলে—বুঝলে মুখুয্যে। কিন্তু এদানি তোমার রোজই এমনি সব বিশ্রী ভুল হচ্চে। তোমায় দিয়ে আর কাজ চলবে না। তোমায় পঁয়ত্রিশ টাকা দিতে হয়, ওর অর্দ্ধেক দিলে আমি একজন মজবুত হুঁসিয়ার ছোকরা পাব।"

"হুজুর তবে আমার একটা বন্দোবস্ত করে দিন। চাকরী গেলে আমরা খাব কি?"

"ত্রিশ বচ্ছর চাকরি করচ, অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ শ টাকা তো ব্যাঙ্কে জমিয়েচ, তাই খাবে।"

"হুজুর আমার ত্রিশ পয়সার সংস্থান নেই।"

এটর্ণি বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—এমন অসম্ভব মিথ্যা কথা সে জন্মে শুনে নাই। রামচরণ মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "তবে আমায় একটা সার্টিফিকেট দিলেও আমার ঢের উপকার করা হবে।"

"সার্টিফিকেট দেবার মতো হলে তোমায় তাড়াবই বা কেন? আমি সার্টিফিকেট দিলে লিখে দেবো তুমি অকর্ম্মণ্য বলে তোমায় বরখাস্ত করা গেল।"

রামচরণ লজ্জায় অপমানে দুঃখে কষ্টে এতটুকু হইয়া খাজাঞ্চির উঁচু ডেস্কের সামনে গিয়া টাকা গণিয়া লইতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

এতক্ষণ আপিসে টুঁ শব্দটি ছিল না—ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায় এমনি নিস্তব্ধ। রামচরণ বাহিরে আসিতেই বাবুর ব্যবহারের সমালোচনার তরঙ্গ উঠিল, সকলেই একমত, এতকালের পুরাতন চাকরটাকে এমন করিয়া তাড়ানো বাবুর ভালো হইল না। বাবুর বাবা ছেলের নাম সদয় রাখিয়াছিল কেন তাহা কেহই ভালো বুঝিতে পারিল না।

রামচরণ ব্যথিত মনে মন্থর গমনে গৃহে ফিরিল। তাহার মুখ দেখিয়া গৃহিণী বলিল "এত সকাল সকাল এলে যে আজ? অসুখ করেনি তো?"

রামচরণ বসিয়া পড়িয়া হতাশ ভাবে বলিল "গিন্নি, আজ আমার চাকরি গেছে।"

গিন্নির মনটা ছাঁত করিয়া উঠিল, একটা দারুণ বিভীষিকা দাঁত মেলিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তথাপি স্বামীকে সাহস দিয়া বলিল;"তা গেছে গেছে। এক দোর বন্ধ হাজার দোর খোলা। তার আবার ভাবনা কি?" রামচরণের চিত্ত কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিল না।

পর দিন হইতে রামচরণ চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিল। সকাল সকাল দুটি ভাত মুখে গুঁজিয়া বাহির হয়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যর্থমনোরথ হইয়া সন্ধ্যায় সময় বাড়ী ফেরে। কোনো এটর্ণি-আপিসে তাহার চাকরি জুটিল না, সবাই জানে সদয় শীল তাহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া জবাব দিয়াছে। সদাগর

আপিস ঘুরিয়া ঘুরিয়া হায়রান হইল, বৃদ্ধ স্থবিরকে কেহ চাহে না। কোথাও চাকরি জুটিল না।

রামচরণের পুঁজি কিছুই ছিল না। গিন্নির হাতে শতখানেক টাকা আর সামান্য কিছু গহনা মাত্র সম্বল। বসিয়া বসিয়া খাইতে খাইতে তাহাও শেষ হইয়া আসিল। গিন্নি মুদির দোকানের সুপারি কাটিয়া, ঠোঙা গড়িয়া, কালীঘাটের পটে রং লাগাইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল—কিন্তু তাহাতে এতগুলি প্রাণীর কি বা হয়। ধার হইতে লাগিল, ক্রমে ধারও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। এই দারুণ দারিদ্র্যের উপর পাওনাদারের দুরন্ত তাগাদা রামচরণের জীবন একেবারে দুর্বহ করিয়া তুলিল।

কোনো বেলা আহার জোটে, কোনো বেলা জোটে না, এমনি অবস্থা। যে দিন জোটে ছেলে মেয়েগুলিকে খাওয়াইয়া বুড়োবুড়ীর জন্য বেশি কিছু থাকে না। এমন কদিন কাটে আর! রামচরণ আকুল হইয়া উঠিল।

ভাবনা চিন্তা অনাহার ও ব্যর্থ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া রামচরণ পীড়িত হইয়া পড়িল। রামচরণ বলিল "গিন্নি, ঈশ্বর করুন শীগগির যেন আমার মরণ হয়। তা হলে তোমরা আমার জীবন বীমার হাজার খানেক টাকা পেয়ে যাবে।"

গিন্নি বিরক্তির স্বরে বলিল "আঃ কি যে বল সব অলক্ষুণে কথা। অমন টাকা আমাদের চাইনে।"

"আচ্ছা গিন্নি, তাহলে আর এক কাজ করলে হয় না?"

"কি?"

"ছেলেগুলোকে বড়লোকের ঘরে পুষ্যিপুত্তুর দিলে আর মেয়েগুলোকে বংশজের ঘরে বেচে ফেললে হয় না?"

"বালাই ষাট। কোলের ছেলে বেচতে যাব এমনি কি আমরা হতভাগা? জীব দিয়েছেন যিনি আহার জোগাবেন তিনি। আমাদের ভাবনা তিনিই ভাবছেন।"

রামচরণ স্ত্রীর কাছে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—সব চেয়ে ভালো হয় যদি আমি মরি। যদি না মরি—তবে ছেলেমেয়েগুলোকে বেচে ফেললে ওদেরও লাভ আমাদেরও লাভ। গিন্নিকে অল্পে অল্পে বুঝিয়ে বলতে হবে।

রামচরণ ভুগিয়া ভুগিয়া সারিয়া উঠিল। ঔষধ পথ্য জোগাইতে জোগাইতে গিন্নির হাত একেবারে খালি—স্বামীর অসুখের সময় বেচারা বাগিরের কাজ করিবারও অবসর পায় নাই। আজ বাড়ীতে মাত্র একটি আনি সম্বল—আর কোথাও কিছুই নাই।

রামচরণ বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। ছেলে-মেয়েগুলো ক্ষুধায় নেতাইয়া পড়িয়াছে। এক এক বার কাঁদিতেছে। এমন সময় ডাকহরকরা একখানা চিঠি দিয়া গেল।

সে চিঠি কোনো আপিসে চাকরির নিয়োগপত্র নয়, সেখানি রামচরণের জীবন বীমার চাঁদা দিবার তাগিদ পত্র। যাহার ঘরে একটি মাত্র আনি সম্বল, সে কোথা হইতে পনেরো টাকা দশ আনা জোগাড় করিবে? তবে কি এত দিনের কষ্টের সঞ্চয় সব খোয়াইবে? সব দিক রক্ষা পায়, যদি সে এই সপ্তাহে মরিতে পারে। হে ভগবান্! মৃত্যু দিয়া দরিদ্রকে বাঁচাও!

রামচরণ একটু সুস্থ হইয়াই আবার চাকরির চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। এক দিন সংবাদ পাইল হ্যারিসন রোডে গ্র্যাণ্ড হোটেলে একজন লোকের দরকার আছে। আশা নাই—তবু

একবার দুর্ভাগ্যের ভাগ্য যাচাই করিয়া দেখা। কোনো রকমে পনেরো টাকা দশ আনা জোগাড় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা।

গ্র্যাণ্ড হোটেল পাঁচতলা বাড়ী। উপরতলায় উঠিতেই বেচারার প্রাণান্ত। উঠিয়া একেবারে বেদম হইয়া পড়িল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল "ম্যানেজার বাবু কোথায়?" শুনিল তিনি ছাতের উপর হাওয়া খাইতেছেন। বেচারাকে আবার সিঁড়ি ভাঙিয়া ছাতে উঠিতে হইল।

খোলা ছাত। রামচরণ ছাতের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল "কে?"

রামচরণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "আজ্ঞে শুনেছিলাম একটা কাজ—"

"সে তো ভর্ত্তি হয়ে গেছে।"

জগতের যত কাজ সব ভর্ত্তি—কেবল বেচারা রামচরণের উদর শূন্য, ভবিষ্যত শূন্য, সংসার শূন্য, আশা শূন্য—সব শূন্যাকার। তবু আর একবার জিজ্ঞাসা করিল "আর কোনো কাজ এখন খালি নেই?"

"আছে, বাবুর্চ্চির কাজ।"

বাবুর পারিষদেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রামচরণের বুক ভাঙিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ও চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া রক্তের ঘূর্ণী তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। রজনী-মুখের ম্লান আলোকে ঝাপসা দৃষ্টিতে রামচরণ দেখিতে লাগিল পাঁচতলার নীচে সে কী অবাধ ব্যস্ত জনপ্রবাহ—কত বড় বড় জুড়িগাড়ী রাস্তা

কাঁপাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু রামচরণের দিকে ফিরিয়া তাকায় এমন কেহ এ জগতে নাই। নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে কী গভীর!

ভাবিতে ভাবিতে রামচরণের ক্লান্ত দুর্ব্বল মাথা ঘুরিয়া উঠিল, পা কাঁপিয়া গেল, দেহ টলিয়া পড়িল। রামচরণ পাঁচতলার ছাত হইতে নীচে পড়িয়া গেল। নিমেষ মধ্যে তাহার সকল যন্ত্রণার শেষ হইল।

জীবন বীমা আপিসের অনুসন্ধানে সকল সাক্ষী সাবুদই বলিল দৈবদুর্ঘটনা। কেবল রামচরণের স্ত্রীই বুঝিল যে রামচরণ আপনি মরিয়া আপনার পরিবারের বাঁচিবার সংস্থান করিয়া গেছে।

ব্যবধান

বৃদ্ধ মসরফের পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সামান্য জোত জমিটুকুও যখন প্রবল জমিদারের কবলগত হইল, তখন সে দীর্ঘ-নিশ্বাসে আল্লার কাছে সকল দুঃখ নিবেদন করিয়া দিয়া তাহার পিতৃপিতামহের আবাস ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গের সম্বল একমাত্র স্নেহের সন্তান মেহের, একটি ভাঙা বদ্‌না ও কয়েকটি টাকা।

স্বদেশী বন্ধুর গৃহে থাকিয়া দুই একদিনের অন্বেষণে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর একখানি ক্ষুদ্র খোলার ঘরে সে একটি ছোটখাটো হোটেল খুলিল। যে মসরফ একদিন কত লোককে অন্ন দিয়াছে,

সে দরিদ্র হইয়া পড়িলেও পরের গৃহে গলগ্রহ হইয়া থাকিতে পারিল না। আর কেই বা চিরকাল তাহাকে আশ্রয় দিত। তাই পয়সা লইয়াও পরকে অন্ন দিবার আনন্দ পাইবে বলিয়া মসরফ হোটেল খুলিল—সদাব্রত খুলিবার মতো অবস্থা ত আল্লা তাহার রাখেন নাই।

মসরফ বৃদ্ধ; তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কেশ শুভ্র। সে কিঞ্চিৎ স্থূল, মধ্যমাকৃতি। স্বভাব বড় ধীর, স্বল্পভাষী, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে কি এক অলস আবেশ নীরবে প্রাণের বেদনা জ্ঞাপন করিত।

মসরফের পূর্ব্বপুরুষের নাকি ধনবান বলিয়া খ্যাতি ও কোনো নবাব বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ শোণিত-সংস্রব ছিল। এক্ষণে তাহার অবস্থায় নিতান্ত ভাটা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তবু সে বনিয়াদি। তাহার বনিয়াদি চালের পরিচয় একটা চটের পর্দ্দা, মাটির গুড়গুড়ি, তামার ভাঙা বদ্‌না প্রভৃতিতে এখনো বিদ্যমান ছিল। মসরফ ও মেহেরের একটিমাত্র পরিচ্ছদের অধিক ছিল কিনা সন্দেহ। মেহের চিরদিন সকল সময়েই একটি লাল কোর্ত্তা, একখানি ফিরোজা রঙের শাড়ী ও এক জোড়া ক্ষুদ্র জরির জুতা পরিয়া থাকে। মসরফ বাড়ীতে একখানা ময়লা ধুতিতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া লজ্জা নিবারণ করে; নমাজ পড়িবার সময় কিংবা কোথাও যাইতে হইলে একটা ঢিলা পাজামা, একটা নিম-আস্তিনের চাপ্‌কান, একটা পুরাতন সদ্‌রী, ও একটা বিবর্ণ আমামা ব্যবহার করিয়া নিজের ভদ্রতা ও বনিয়াদি চাল বজায় রাখে।

বৃদ্ধ সদাই ম্রিয়মাণ, অশ্রুভারাবনত চক্ষে একখানা ছিন্ন মাদুরে বসিয়া থাকে; আর চঞ্চলস্বভাব বালিকা ফুল্ল মুখে পিতার বিরল-

কেশ মস্তকে হাত বুলায়, মিছামিছি হাসিয়া পিতাকে হাসাইবার চেষ্টা করে। মসরফ একটু হাসিলে মেহের তাহার কোলে লুটাইয়া পড়ে, না হাসিলে বালিকা ফুটপাথের উপর ছুটিয়া গিয়া বালক-ভৃত্য ইস্‌মাইলের সঙ্গে খেলা করে; তাহাদের স্নেহপালিত কুকুর কাল্লুও মেহেরের কাপড় টানিয়া, পায়ে লুটাইয়া, লাফাইয়া, ছুটিয়া তাহাদের খেলায় যোগ দেয়। কুকুরের ক্রীড়া দেখিয়া বৃদ্ধের ক্লিষ্ট বদন অধিকতর কাতর হইয়া উঠে, পাছে মেহেরের কাপড়খানি ছিঁড়িয়া যায়। মেহেরের কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য থাকে না।

মেহেরের বয়স ১২ বৎসর হইবে। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর না হইলেও সে সুশ্রী বটে। দেহ ক্ষীণ, এজন্য তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা দেখিতে ছোট বোধ হয়, কিন্তু তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব তাহার বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অবহেলা করিতেছিল না। মসরফ দুই বৎসর হইল কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে মেহেরের যৌবনশ্রী তাহার বাহিরের সকল চাঞ্চল্য আহরণ করিয়া মনের ভাণ্ডারে জমা করিতেছিল; পরিপূর্ণ অন্তরের ঐশ্বর্য্য তাহার স্বচ্ছ চোখ দুটির ভিতর দিয়া উপচিয়া পড়িত।

২

অমিতাভ প্রেসিডেন্সি কলেজে এল, এ, পড়ে। তাহার মেদিনীপুরের মধ্যে ছোটখাটো একটু জমিদারী আছে। প্রত্যহ কলেজে যাইবার সময় অমিতাভ হোটেলের সম্মুখের ফুটপাথে মেহেরকে খেলা করিতে দেখে। তাহাকে প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে অমিতাভ'র মন তাহার প্রতি কেমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। যৌবনের প্রারম্ভে রমণীপ্রেমের একটা লালসা

এমন প্রবল হইয়া উঠে যে স্থান, কাল, পাত্র বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। অমিতাভ সহাধ্যায়ী-বিযুক্ত হইয়া একাকী কলেজে গমনাগমন আরম্ভ করিল। যদি কোনো দিন তাহার কলেজে যাইবার সময় মেহের গৃহাভ্যন্তরে থাকে, তবে তাহার নির্গম প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া করিয়া অমিতাভ বিলম্বে কলেজে উপস্থিত হয়।

মেহেরের ছেলেবেলার সেই লাল কোর্তাটি যৌবনসমাগমে আঁটো হইয়া তাহার বর্তুল দেহখানিকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছে। তাহার চক্ষে লজ্জা আসিয়াছে; উচ্চ হাস্য ও চঞ্চল চরণ মৃদু শান্ত হইয়াছে।

অমিতাভ'র বড় ইচ্ছা মেহেরের সহিত কথা বলিয়া তাহার নামটা জানিয়া লয়। বহু বিনিদ্র বিভাবরী এই ভাবনাতে তাহার কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন নৈশপাঠ সমাপ্ত করিয়া অন্ধকার ঘরে শয়ন করিয়া অমিতাভ সেই মুসলমানীর সহিত কথা কহিবার ছল উদ্ভাবনে মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তিটা নিয়োজিত করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিছু ঠিক্ করিতে না পারিয়াই ঠিক করিল, বালিকা সন্ধ্যার পরও রুটি বেচে; সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া রুটি কিনিবার ছলে তাহার সহিত কথা কহিতে হইবে।

কিন্তু রুটি কিনিবার সময় পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ অমিতাভ'র চিরপুষ্ট সংস্কারটা বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। কত সন্ধ্যা আসিল ও গেল, তাহার রুটি কেনা আর হয় না। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে; রাত্রে ভাবিয়া চিন্তিয়া মনকে আবার দৃঢ় করে; কলেজের পথে মেহেরকে দেখিয়া সে সঙ্কল্প দৃঢ়তর

হয়; কিন্তু আবার সন্ধ্যার সময় তাহার সাহসে আর কুলায় না।

এমনি করিয়া রোজ সে রুটির দোকানের কাছে যায়, আবার অপ্রস্তুত ভাবে ফিরিয়া আসে। মেহের বসিয়া বসিয়া ইহা দেখে আর বাবুর রকম দেখিয়া মনে মনে হাসে।

একদিন যেমন অমিতাভ ইতস্তত করিতে করিতে দোকানের কাছে গিয়াছে অমনি মেহের হাসিভরা সুন্দর মুখের সকৌতুক দৃষ্টি হানিয়া বলিল "বাবু, আপনার কি চাই?"

অমিতাভ মুখচোখ লাল করিয়া বলিয়া ফেলিল "আমায় একখানা রুটি দাও ত।"

মেহের রুটি তুলিয়া বাবুর হাতে দিবার সময় ঘাড় বাঁকাইয়া অমন করিয়া হাসিল কেন তা সেই জানে। দাম চুকাইয়া দিয়া কোন পথ দিয়া কখন কেমন করিয়া অমিতাভ যে বাসায় ফিরিয়াছে তাহা সে টেরও পায় নাই,—তাহার চোখের সামনে শুধু জলিতেছিল মেহেরের সেই চমৎকার হাসিখানি, একখানি ধারালো ছুরীর মতো, একটুকরা খাঁটি হীরার মতো।

একবার বরফ যখন গলিল তখন ভাবের নদী বহিতে আর বিলম্ব সহিল না, কোনো বাধা আর বাধা রহিল না। অমিতাভ মেহেরের দোকানের বাঁধা খরিদদার হইয়া উঠিল। এখন আর মেহেরের সহিত কথা বলিতে তাহার লজ্জায় বাধে না—ফুটপাথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কত কি গল্প করে। ক্রমে বৃদ্ধ মসরফের সহিতও তাহার আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল; তাহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, সদয় ভাবে কথা কহিয়া অমিতাভ শীঘ্রই বৃদ্ধের স্নেহ ও সম্মান লাভ করিল।

একদিন সন্ধ্যার পর অমিতাভ রুটি কিনিল। দোকানে তখন মেহের একা ছিল। মূল্য দিয়া প্রস্থান করিলে মেহের দেখিল ডবল পয়সা ভ্রমে বাবু দুটি টাকা দিয়া গিয়াছেন। সে পিতাকে বলিল।

পরদিন আবার সাক্ষাৎ। টাকা ফেরত লইয়া মসরফের সহিত অমিতাভ'র অনেক তর্ক হইল। অমিতাভ বৃদ্ধকে বুঝাইল, সে এত কাঁচা ছেলে নহে যে পয়সার বদলে টাকা দিবে। টাকা সেদিন তাহার নিকটে ছিলই না। অমিতাভ কিছুতেই টাকা ফেরত লইল না।

তখন বৃদ্ধ মসরফ হাসিয়া বলিল "এ টাকা তবে মেহেরকে মেহেরবানি করে খোদা দিয়েছে। এ টাকা মেহের তোর!"

মেহের লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। এই অতিবড় লজ্জার রহস্যভরা টাকা দুটি লইয়া সে তাড়াতাড়ি আপনার কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিল।

ভালোবাসা দিয়া ক্রমশ আঘাত করিতে থাকিলে, আহত প্রাণও কিছু না কিছু ভালোবাসিতে বাধ্য হয়। ক্রমে এমন হইল যে মেহের অমিতাভকে দেখিলে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আর তাহার বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী ইস্‌মাইলের চক্ষু ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠে।

উভয় পক্ষে বেশ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। বছর দুই পরে বৃদ্ধের সহিত একদিন কথোপকথন করিতে করিতে মেহেরের বিবাহের কথা উঠিল। মসরফ বলিল, "ইস্‌মাইল ছেলেবেলা থেকে আমার কাছে আছে, আমি তাকে ছেলের মতো দেখি; সেও মেহেরকে খুব ভালোবাসে; আর কোথায় খুঁজব, ওর সঙ্গেই মেহেরের বিয়ে দেবো।"

অমিতাভ ঢোক গিলিয়া কাশিয়া বলিল, "বেশ ত। তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে ইস্‌মাইল হয় ত তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে যাবে। তুমি তখন একা কি কর্‌বে। তার চেয়ে আমার জমীদারীতে তোমরা সকলে গিয়ে চাষবাস কর, এই আমার ইচ্ছে, কি বল মিঞা?"

এই প্রস্তাবে বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু মেহেরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, আর ইসমাইল মহা আপত্তি করিল। অবশেষে বৃদ্ধ ও অমিতাভই জয়ী হইল।

অমিতাভ'র বসতবাটীর সন্নিকটে মসরফের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অমিতাভও কলেজ ছাড়িয়া বাড়ী গিয়াছে, স্বয়ং না দেখিলে কর্ম্মচারীরা বড় ফাঁকি দেয়, ঠকায়। অমিতাভ'র প্রাণে ভিতরে ভিতরে যে বিষম ঝঞ্চা চলিতেছিল তাহার সহিত অবিশ্রাম সংগ্রাম করিয়াও তাহা সে নিবারণ করিতে পারিতেছিল না।

সকালে বৈকালে সে বেড়াইতে যায়; মেহের সেই সময়ে রূপের ঢেউ তুলিয়া জল আনিতে আসে; দূর হইতে তাহার ছায়া দেখিয়াও অমিতাভ তাহাকে চিনিতে পারে; অমনি সে পথ ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরে। তবু মেহেরকে একটিবার দূর হইতে দেখিবার প্রলোভন অমিতাভকে নিত্যই সেই ঘাটের পথে বেড়াইতে বাহির করে। যদি কোনো দিন অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে উভয়ে কাছাকাছি হইয়া পড়ে, তখন অমিতাভ'র ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব হয়, চক্ষু পিপাসিতের মতো চাহিয়া থাকে; মেহের তখন ত্রস্ত

ব্যস্ত হইয়া শূন্য কলস লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। তাহাকে তেমন করিয়া ফিরিতে দেখিলে ইস্‌মাইল ব্যাপার বুঝিয়াও জিজ্ঞাসা করে, "ফিরলে কেন?" মেহের একটি করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দেয়। ইস্‌মাইল কখনো কখনো ক্রূর স্বরে বলে, "বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাতে ফেরবার কি আবশ্যক ছিল? বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে ত ভালোই।" তখন মেহেরের দৃষ্টিতে তিরস্কার ফুটিয়া উঠে।

মেহের কায়মনে পতিসেবা করে, কিন্তু তাহার মন কেমন উদাস, উন্মনস্ক। অমিতাভ সামান্য কেরাণীর মতো খাটে, তবু তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। ইসমাইল স্ত্রীর সেবা ও জমিদার বাবুর সাহায্যে সচ্ছল গৃহস্থালী গুছাইয়া বসিয়াছিল, তবু তাহার সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

একদিন ইস্‌মাইল বাবুর কাছে গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। অমিতাভ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ইস্‌মাইল?"

ইস্‌মাইল জোড়হাত করিয়া কহিল, "আপনার যথেষ্ট দয়া, কিন্তু তা ভোগ করা আমার অদৃষ্টে নেই। আমি আর এখানে থাকব না।"

অমিতাভ একটা নিশ্বাস জোরে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমিও তোমায় বলব মনে করেছিলাম। তুমি আমার ইস্‌লামপুর কাছারির এলাকায় গিয়ে বাস করগে।"

ইস্‌মাইল কহিল, "আপনার জমিদারীতে বা এদেশে যেখানে আপনার নাম শোনা যাবে সেখানে আর থাকব না।"

অমিতাভ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সেই ভালো। কবে যাবে?"

ইস্‌মাইল কহিল, "কালই।"

এ উত্তরটা অমিতাভকে আঘাত করিল। প্রস্তুত থাকিলে আঘাতগ্রহণ করা তত কষ্টসাধ্য হয় না; অতর্কিত আঘাতে চিত্ত স্তম্ভিত হইয়া যায়। অমিতাভ অনেকক্ষণ পরে বলিল, "কালই যাবে? দু'দিন পরে গেলে হয় না।"

ইস্‌মাইল বলিল, "আজ্ঞে না, কালই যাব।"

অমিতাভ অন্যমনস্কভাবে ছোট্ট একটি "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ইস্‌মাইল বলিল, "একটু দাঁড়ান। এই গহনাগুলি আমার বিয়ের সময় আপনি মেহেরকে দিয়েছিলেন। এগুলি আপনাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।" বলিয়া ইসমাইল হাতের উপর গহনাগুলি প্রসারিত করিয়া ধরিল।

অমিতাভ একবার চকিতে সেদিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল, "আমি দিয়েছি, আর নিতে পারিনে। তুমি ওসব বেচে ফেলো বা যে কোনো উপায়ে হস্তান্তরিত কোরো; আমার আপত্তি নেই।"

ইস্‌মাইল সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

ইস্‌মাইল অমিতাভ'র দেওয়া সকল জিনিষ বেচিয়া ফেলিয়া মেহেরকে লইয়া অমিতাভ'র জমিদারী ছাড়িয়া যখন চিরদিনের জন্য অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করিল তখন সে মনে করিল এইবার স্ত্রীর মন হইতে বাবুর স্মৃতি সে একেবারে মুছিয়া দিয়া যাইতেছে; কিন্তু তখনো মেহেরের বাক্সের মধ্যে অমিতাভ'র রুটি-কেনা টাকা দুটি লক্ষ্মীর কৌটার টাকার মতো সযত্নে সঞ্চিত ছিল, অত্যন্ত অভাবের দিনেও মেহের তাহা খরচ করে নাই। আর মনের মধ্যে মেহেরের যাহা সঞ্চিত ছিল তাহার সংবাদ ত আরো নিগূঢ়, ইস্‌মাইলের আরো অজানা।

যেখানে মেহেরের বাড়ী ছিল, সেখানে একটি সুন্দর উদ্যান রচিত হইল। আর তাহার মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইল একটি অবগুণ্ঠনাবৃতা ড্যাফ্‌নি মূর্ত্তি। অমিতাভ তাহারই চরণতলের বেদিকায় বসিয়া বিষণ্ণ বদনে বিরস সন্ধ্যাগুলি কাহার ধ্যানে না জানি যাপন করে। *

পরখ

বিনোদ ও শীতল বাল্যবন্ধু। বিনোদ যেন দীর্ঘরাত্রির সুনিদ্রার পর উষার প্রথম স্পর্শে জাগ্রত; শীতল যেন দিবানিদ্রার ক্ষণিক উপভোগের পর উত্থিত। বিনোদ আনন্দময়, হাস্যশীল; শীতল নিরানন্দ, বিরক্ত। বিনোদ কবি; শীতল দার্শনিক। উভয়ে জগন্নাথ পুরীতে ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাস করে। উভয় বন্ধু সাগরের বেলাভূমিতে সন্ধ্যাসকাল যাপন করে।

উপরে উদার অনন্ত নীল আকাশ, নিম্নে উত্তাল অনন্ত নীল সিন্ধু। যেন সোনারূপার মিনা-করা নীলার একটি বিশাল কৌটার মধ্যে দুটি পোস্তদানা জড়াজড়ি করিয়া গড়াগড়ি দিতেছে।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অবর্ণনীয় শোভা দেখিয়া কবি বিনোদ ভাবগদ্গদ হইয়া পড়ে, শীতল দৃষ্টিবিভ্রম ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া যায়। বিনোদ বলে, 'ভাই, সংসারটা হিন্দুর দেবী-প্রতিমার মতো বড় সুন্দর; উপরের সৌন্দর্য্য ভাঙিয়া কেন বিশ্রী খড়গুলা টানিয়া বাহির কর?' শীতল বলে, 'সংসারটা ঝুনা নারিকেলের মতো;

ছোবড়া, মালা ভেদ করিয়া কঠিন দুষ্পাচ্য শাঁস, তারপর একটু ঝাল জল, তারপর শূন্য খোল।'

শীতল উন্মনস্কভাবে চলিতে চলিতে পড়িয়া যায়, বিনোদ করতালি দিয়া কলরব করিয়া হাসে; আর শীতল ভারকেন্দ্রের বিপর্য্যয়ে মাধ্যাকর্ষণের অবশ্যম্ভাবী ফল যে পতন তাহাতে হাস্যের কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না।

বিনোদ একটা ফুল পাইলে সুখী হয়; শীতল পত্রপুষ্পের অপার্থক্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করে।

বিনোদ কাহারো বল, সাহস, বিদ্যা, বুদ্ধি দেখিয়া প্রশংসা করিলে শীতল বাকল্‌এর মতো পারিপার্শ্বিক সুবিধার দোহাই দিয়া প্রশংসাটা উড়াইয়া দিতে চায়—শীতলের নিকটে জগতে কাহারও কোনো বিশেষ গুণ নাই, আছে কেবল সুযোগ ও সুবিধা। তাহাতে লোকের বাহাদুরী কি? বিনোদ বলে, 'সেই সুযোগ অন্য লোক অপেক্ষা তাহার আয়ত্তাধীন হইয়াছে এই তার বাহাদুরী।'

বিনোদ বলে, 'অমুক লোকের এই গুণ আছে।' শীতল দেখায়, 'তাহার এই এই দোষ আছে।'

বিনোদ বলে, 'ভাই, সংসারে যাহা আছে, তাহাই পাইয়া সন্তুষ্ট থাক, যাহা নাই তাহার জন্য কাতর হইও না। টাকাটা ষোল আনা এই যথেষ্ট, পাঁচসিকা নহে বলিয়া দুঃখ করিও না।'

শীতল বলে, ' 'নাই'র তুলনায় 'আছে'টা যে নাই বলিলেও হয়। ষোল আনার কত পাই মেকি ও ঘসা তাহার খবর রাখ কি?'

বিনোদের নিকট জগতে শুধু সুখ আর আনন্দ। শীতলের নিকট শুধু দুঃখ আর দ্বন্দ্ব।

বিনোদ আত্মীয় স্বজনের প্রেম স্নেহ দয়াতে মুগ্ধ হয়। শীতল তাহাদের স্বার্থপরতার জ্বালায় অস্থির।

বিনোদের নিকট সংসার উপভোগের সামগ্রী। শীতলের সম্মুখে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ঘাঁটি বাঁধিয়া বসিয়া কেবলই ভয় দেখাইতেছে। বিনোদের নিকট মৃত ব্যক্তিও স্মরণে, চিহ্নে, ব্রহ্মবক্ষে জীবিত থাকে। শীতলের নিকট জীবিত ব্যক্তিরাও সব মরা; জীবনটা মায়াপ্রপঞ্চ। মৃত যে জীবিতবৎ বোধ হয় সেটা ইল্যুশন বা ভ্রান্তি।

বিনোদ শীতলকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করে 'কি হে, তোমার মায়াবৃক্ষের ফল, চেতনবৎ প্রতীয়মান কিন্তু আসলে মরা, মেয়েটা কেমন আছে?' শীতল বিপত্নীক বিনোদকে পাল্টা প্রশ্ন করে, 'কি হে, তোমার জ্যান্ত ব্রহ্মসুপ্ত পত্নীর হালি খবর কি?'

একদিন বিনোদ হাসিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বন্ধু তোমার নিকট ত সকল জীবই মরা। তোমার শিশুগুলি ত মরাই জন্মে। আচ্ছা, মরা শিশু ও মরা শিশুর মরা মা যদি আর চেতনবৎ মায়ার উৎপাদন না করে, তবে তোমার শোক হয় কি না?' শীতল গম্ভীরভাবে বলিল, 'দার্শনিকের আবার শোক কি?'

কিছুদিন পরে শীতল বাড়ী হইতে এক টেলিগ্রাম পাইল, 'Your wife and children died of cholera on 31st April.' শীতলের চক্ষু-দরিয়ায় বান ডাকিয়া গণ্ডবেলা জলময় হইয়া গেল। সাগরের জোয়ার দিনরাত্রে দুইবার হইল গেল, শীতলের অশ্রুসাগরে একটানা জোয়ার আর থামে না। বিনোদ হাসে, শীতল বিরক্ত হইয়া আরো কাঁদে।

বিনোদ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'দার্শনিকপুঙ্গব, তোমার

এত মায়া? কিংবা আমারই মায়া বৃদ্ধি হইয়াছে, যাহাতে তোমার হাসিটা আমি অশ্রুর মতো দেখিতেছি?'

শীতল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'ভাই, এখন দেখিতেছি কেতাবী বিদ্যাটা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা বড় কঠিন।' বিনোদ হাসিয়া বলিল, 'যাহোক একটা শোকে অনেকগুলা শুভ আনয়ন করিল। জীবনটা তোমার নিকট আজ তবু বাস্তব ঘটনা। জীবন বেচারার পরম ভাগ্য! আর কেতাবী জ্ঞানটা বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে না পারিলে যে কি অনর্থ ঘটে, তাহার তুমিই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু গর্দ্দভপ্রসাদ, বোকচন্দ্র, ৩১শে এপ্রেল কি তোমার স্ত্রীপুত্রের মৃত্যুর জন্য বিশেষভাবে ফরমাস দেওয়া হইয়াছিল?'

'আঁঃ, তাইত?' বলিয়া শীতল বদনব্যাদান ও লোচনবিস্ফারণ করিল।

বিনোদ হাসিয়া বলিল, 'ওটাও মায়া বা বিনোদচন্দ্রের practical joke.'

শীতল কুণ্ঠিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'এঁ—দুঃখটাই আমার নিজস্ব element কি না, তাই সেটাতে আমার চিত্তবৃত্তি সব বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল।" সুখের সংবাদে কখনো এরূপ হইত না।'

বিনোদ মুখে শুধু হাসিল, আর মনে মনে বলিল, 'আচ্ছা।'

কিছুদিন পরে শীতল এক টেলিগ্রাম পাইল যে কালিকাপুরে এক মুন্সেফী পাইয়াছে। প্রথম মুহূর্ত্তে বেচারা আনন্দে অস্থির। তৎপরে ডাইরেকটারী প্রভৃতিতে কালিকাপুরের নাম খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেচারা হাল্লাক, কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে না আছে

কালিকাপুর নামে একটা জেলা, না আছে একটা মহকুমা বা থানা। পোষ্টাল-গাইডে বর্দ্ধমান ও বীরভূমে দুইটা ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসের নাম পাওয়া গেল মাত্র। বেচারা ত একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আর, তাহার রকম দেখিয়া বিনোদের হাসিতে হাসিতে পেটে ব্যথা ধরিল, দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। অনেক কষ্টে একটুখানি দম লইয়া সে বলিল, 'কি হে সুখদুঃখের অতীত দার্শনিক ভায়া, অবস্থাটা কেমন বোধ হচ্ছে ?'

শীতল বুঝিল ইহাও বিনোদের নষ্টামি। তখন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'জান কি ভাই, উদর হচ্ছেন প্রত্যক্ষ দেবতা; তাঁর শাসনে মস্তিষ্কটা স্থির রাখা কঠিন।'

বিনোদ হাসিয়া বলিল, 'বন্ধু, যাই বলনা কেন, তোমার দার্শনিক খোলসের রং বড় কাঁচা, ধোপে টেঁকে না! ছ্যাঃ!'

সফল-স্বপ্ন

হরিবাবু আপিস হইতে আসিয়াই চাপ্‌কান জুতা সমেত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী বিন্দু তাড়াতাড়ি আসিয়া পাখা করিতে করিতে বলিল, "আজকে কি বড় শ্রান্ত হয়েছ ?" তাহার স্বামীর ম্লান ক্লিষ্টমুখ ও জ্যোতিহীন চক্ষু দেখিয়া বিন্দু বড় ভীত হইয়াছিল।

হরিবাবু বলিলেন, "হাঁ, আজ সমস্ত দিন বড় কষ্ট পেয়েছি, আজ মনটা বড় খারাপ, শরীরটাও কেমন কেমন কচ্ছে। উঃ দুরদৃষ্ট!" তৎপরে বুকভাঙা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

বিন্দু ব্যথিত হইয়া শান্ত সোহাগে স্বামীকে একটি চুম্বন করিয়া স্বামীর চাপকানের বোতাম ও জুতা মোজা খুলিয়া দিয়া কাপড় ছাড়াইয়া হাত মুখ ধুইবার জল দিল। এবং সেবা শুশ্রূষায় স্বামীকে সুস্থ করিতে, যত্ন করিতে লাগিল।

বিন্দু বারো বৎসর হরিবাবুর গৃহিণী। কিন্তু বিন্দু এখনো যেন নবোঢ়া বধূটির মতো ব্রীড়াময়ী, সোহাগশীলা এবং স্বামীতে নিতান্ত নির্ভরপরায়ণা। এখন প্রেমের আগ্রহ-আবেগ উচ্ছ্বসিত না হইলেও প্রাণের কানায় কানায় থরটানে বহিতেছিল। সে স্বামীকে ম্লান দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া তাঁহার কষ্টের কারণ আন্দাজ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না; তথাপি স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। কষ্টের সময় কষ্টের কথা উত্থাপন করিতে সে ভালো বাসিত না। সে জানিত যে রাত্রির বিশ্রামে সুস্থচিত্ত হইয়া স্বামী নিজেই সমস্ত বলিবেন —রাত্রির বিশ্রাম, মানসরোগের এমনি চমৎকার মহৌষধি।

বিন্দু খাইবার ঠাঁই করিয়া স্বামীকে ডাকিল। হরিবাবু বলিলেন, "আমি এখন খাব না; যদি ভালো থাকি, একটু রাত্রে খাব। তুমি খাওগে যাও।"

বিন্দু স্বামীর পদতলে আসিয়া বসিল এবং এক হাতে স্বামীর পা চাপিতে ও অন্য হাতে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

হরিবাবুর বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

ঝিমঝিম করিয়া কেমন অবশ শিথিল হইয়া আসিতেছে ; মাথার ভিতর বোঁ বোঁ করিতেছে। জীবনীক্রিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ বিন্দু, কত আশা ভরসা করেছিলাম ; সব শেষ হয়ে গেল। বিন্দু, ঝিকে একটু তামাক দিতে বল ত।" তামাক সকলদুঃখবিনাশন, হতাশের অবলম্বন !

ঝি তামাক আনিয়া দিল। হুঁকায় এক টান দিতেই হরিবাবুর গা বমি বমি করিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার অতি প্রিয় তামাকে যখন অরুচি হইয়াছে, তখন তাঁহার জীবনসঙ্কট নিশ্চিত। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি তামাকও তাঁহাকে ত্যাগ করিল ! হায় !

তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। সংসারে সব যেন ওলট পালট হইয়া যাইতেছিল। বিন্দুকে মনে করিয়া তিনি কাতর হইতেছিলেন। বাল্যাবধি প্রেমময়ী গৃহিণী গৃহকর্ম্ম ও স্বামীসেবায় পরিশ্রম করিতেছেন, আহা, তাঁহাকে কখনো সুখ শান্তি, আরাম বিশ্রাম দিতে পারিলেন না, ইহা কি কম কষ্টের কথা ! তিনি আজ কত আশা করিয়া, কি আনন্দোদ্বেলিত হৃদয় লইয়া আপিসে গিয়াছিলেন,—বিন্দুকে সুসংবাদ দিবেন বলিয়া কতই না আকাশকুসুম চয়ন করিতেছিলেন, কিন্তু হায়, সব আশা ভাঙিয়া গেল, সব আনন্দ দগ্ধ হইল,—আজ একি বিবাদগুরু চিন্তাকুল চিত্তে তিনি শুধু দুঃখ ও পরাজয়ের সংবাদ বহন করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন ! কি দুর্দ্দৈব ! হায় মানুষের আশাবাহিত নির্বুদ্ধিতা ! বিন্দুর ভগ্নী ইন্দু ধনাঢ্যের গৃহিণী, তার কত সুখ,

কত সম্পদ! আর বিন্দু দরিদ্র কেরাণীর হাতে পড়িয়া শুধু কষ্ট লাঞ্ছনাই ভোগ করিতেছে। দুই ভগ্নীর এমন অদৃষ্টের তারতম্য কেন? বিন্দু যদি আমার গৃহিণী না হইয়া কোনো ধনাঢ্যের গৃহ অলঙ্কৃত করিত, সে সুখী হইত, আমিও নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

হরিবাবু চিন্তায় দুঃখে মুহ্যমান হইয়া যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। বিন্দু কাতর হইয়া আগ্রহে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল।

হরিবাবু চিন্তা দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিষ্ফলতার ক্ষোভে তিনি দাঁত কড় মড় করিয়া উঠিলেন।

সংসারের অবহেলা, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার নিম্নতন কর্ম্মচারীর দ্বারা পরাভবে, তাঁহার মর্ম্মস্থল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। পনর বৎসর বয়সে তিনি সাহা লাহা কোম্পানির আপিসে প্রবেশ করেন, সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা। সামান্য বেতনের বিল-সরকার হইতে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কর্ত্তব্য পালন দ্বারা তিনি এখন আপিসের প্রধান কেরাণী। তাঁহার একাগ্র প্রভুসেবার পুরস্কার স্বরূপ সংপ্রতিশূন্যীভূত খাজাঞ্চির পদ তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ছিল; কিন্তু সাহা লাহা বাবুরা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া—সতীশকে কিনা সেই পদ দিলেন! সতীশ ত বালক মাত্র; এবং এতকাল পর্য্যন্ত সে তাঁহারই অধস্তন আজ্ঞাবাহী কর্ম্মচারী ছিল। হায়, প্রভুত্বের কি অবিচার! কাল হইতে তিনি বালকের অধীন, আজ্ঞাবহ হইবেন।

ইহা মনে করিয়া হরিবাবু পুনরায় কাতর শব্দ করিলেন।

তিনি চিন্তা রোধ করিতে পারিতেছিলেন না। এই পরাভব কি তাঁহার দোষে হইয়াছে? যদিও তিনি চিরদিন প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া প্রভুসেবা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি আপন কর্ম্মিষ্ঠতা প্রচার করিবার মতো তৎপরতা তাঁহার ছিল না। তিনি সতীশের মতো অগ্রসুর-নীতিতে পরিপক্ক ছিলেন না; সেই জন্যই আজ সতীশ তাঁহাকে অতিক্রম ও উল্লঙ্ঘন করিয়া খাজাঞ্চির উচ্চ টেবিলের সম্মুখে গিয়া জাঁকাইয়া বসিল, আর তিনি সেই মসীমলিন পুরাতন টেবিলে বসিয়া বালক সতীশের আজ্ঞা পালনের জন্য অপেক্ষা করিবেন! হায় দগ্ধ অদৃষ্ট, ধিক্ নিষ্ঠুর ললাটলিপি!

হরিবাবু বড় আশা করিয়াছিলেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া তিনিই শূন্যপদ পাইবেন। মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে,—বিন্দুকে কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিবেন বলিয়া বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আশাহত হইয়া আজ তিনি একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন; বিন্দুর দিকে চাহিতেও তাঁহার কান্না আসিতেছে। তাঁহার টানাটানির সংসারে বিন্দুর নিপুণ গৃহিনীপণা যথাসম্ভব পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে; হরিবাবু মনে করিয়াছিলেন একটু স্বচ্ছল হইলে বিন্দুর চিন্তা ও পরিশ্রমের লাঘব হইবে; বিন্দুকে নিশ্চিন্ত সুখী দেখিয়া নিজেও নিশ্চিন্ত সুখী হইবেন। হায়, সকল আশা যে ফুরাইল!

তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এখন তাঁহার মরণই মঙ্গল। তাঁহার পাঁচ হাজার টাকায় জীবন বীমা করা আছে। বিন্দু কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া এ যাবৎ "প্রিমিয়ম্" দিয়া সেই "পলিসিটি" বজায় রাখিয়াছে। তিনি মরিলে বিন্দু সেই পাঁচ হাজার টাকা

পাইয়া সুখী হইতে পারে। তাঁহার মৃত্যু একান্তই স্পৃহণীয়—এই মৃত্যুতে বিন্দুর সুখ এবং আপনার পরাভবগ্লানি হইতে অব্যাহতি! তবে এস মৃত্যু এস! হে সকলসন্তাপহরণ, নূতন পরাভব, নূতন দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে আমাকে তোমার শান্ত স্নিগ্ধ ক্রোড়ে গ্রহণ কর। এস মৃত্যু, এস!

হরিবাবু সহসা বক্ষে বেদনা অনুভব করিলেন; তিনি বুঝিলেন, হৃৎপিণ্ডের সহসা-সঙ্কোচনের এ বেদনা। তাড়াতাড়ি বুকটাকে চাপিয়া ধরিলেন, সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

এই ঘটনা এত অতর্কিতে, এত ঝটিতি ঘটিল, যে, তিনি প্রথমত মনে করিলেন ইহা মূর্চ্ছা বা তদ্রূপ আর কিছু। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা সর্ব্বগ্লানিহর মৃত্যুর শান্ত শীতল কোল। তিনি মরণের সীমার মধ্যে আসিয়া বিরাট শান্তি অনুভব করিয়া সুখী হইলেন।

মৃত্যুর পরে তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। বেলুনে উঠিয়া দূর হইতে নগরের বিস্তৃত সম্পূর্ণ চিত্রশোভা দেখার মতো তিনি আপনার মর্ত্ত্যজীবনখানিকে স্পষ্ট, অগুপ্ত, সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলেন। সুন্দর পুণ্যহর্ম্মবীথি, দূর হইতে ধূলিশূন্য, আবর্জ্জনাশূন্য। সুখশান্তির শ্যামশষ্পাবৃত প্রশস্ত ক্ষেত্র, ভাবরাগস্নেহসখ্যের বিচিত্র উদ্যান, শুশ্রূষারূপিণী নদীধারা, সম্মিলিত-নগর কোলাহলের মতো পুত্রকন্যার কলগুঞ্জন বড় অপূর্ব্ব সুন্দর বোধ হইতেছিল। পাপের পঙ্কমলিন প্রণালী ও পূতিময় গহ্বরসকল এই শোভা-সম্মিলনের মধ্যে বড় একটা নজরে পড়িতেছিল না। হরিবাবু দেখিলেন, তাঁহার মর্ত্ত্যজীবন বিন্দুর স্নেহে পরিমার্জ্জিত, সুচিক্কণ, সুন্দর, প্রায় নিখুঁত ছিল।

কিন্তু এই সুন্দর জীবনশোভার ভিতর তাঁহার পুত্রকন্যা ও পত্নীর করুণ বিলাপ বড় মর্ম্মন্তুদ বলিয়া মনে হইতেছিল। আহা, আজ তাহারা তাঁহারই জন্য কাঁদিয়া আকুল। এ ক্রন্দন দেখিয়া দুঃখও হয়, সুখও হয়।

বিন্দুর ভগ্নী ইন্দু, ভগ্নীপতির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, বিন্দুর বাড়ীতে আসিয়া, কাঁদিয়া আছাড়িয়া পড়িল। ধনাঢ্যগৃহিণী গর্ব্বিতা ইন্দুকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া হরিবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। সুখীও হইলেন। প্রথম শোকবেগ শান্ত হইলে ইন্দু বলিল, "দিদি, তোর ভাগ্যে এমন কেন হ'ল? হরিবাবু যে তোকে বড় ভালোবাসত দিদি; আমি অভাগিনী স্বামীস্নেহবঞ্চিতা, তোর বদলে আমি বিধবা হ'লে ত কোনো ক্ষতি হ'ত না।" ইন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ইন্দুর কান্না দেখিয়া হরিবাবুরও কান্না আসিতেছিল; কিন্তু আত্মা কাঁদে না বলিয়া তিনি কান্না চাপিয়া শুধু দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, "হায়, আমি কি ভ্রান্ত; মনে করিতাম ধনাঢ্য-বধূরা বুঝিবা বড় সুখী। বিন্দুর অর্থকষ্ট দূর করিবার জন্য আমি মৃত্যুকে আবাহন করিয়া বরণ করিলাম। কিন্তু বিন্দুর সুখের তুলনায় ইন্দু আপনাকে অভাগিনী মনে করিতেছে!, বিন্দু সুখী ছিল, শুনিয়াও সুখ হইল।" জীবনে যে ঘটনাসূত্র জটিল বোধ হইত, এখন মরণের ঐন্দ্রজালিক পারে দাঁড়াইয়া হরিবাবু একে একে সেসকল মুক্ত দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে প্রতিবাসী পরিচিতদিগের দুঃখ দেখিয়া হরিবাবু বড় আরাম অনুভব করিলেন। রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবু প্রভৃতির উপর জীবদ্দশায় তিনি কত বিরক্ত হইয়াছেন;

তাঁহাদিগকে সহানুভূতিশূন্য ভব্যতাবর্জ্জিত বর্ব্বর মনে করিয়া কত অবিচার করিয়াছেন। এখন তাঁহারাই তাঁহার মৃত্যুতে কাতর হইয়া, তাঁহারই ছেলেমেয়েগুলিকে যত্ন করিতেছেন, বিন্দুকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দিতেছেন। হায়, এখন জীবনের পরপারে আসিয়া অতীতের ত্রুটি সংশোধন করিবার উপায় কৈ ?

সন্ধ্যার সময় গৃহের মধ্যে যখন অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়া জমাট বাঁধিতেছিল, যখন ঝি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দেখাইতেছিল, যখন ক্রন্দনক্লান্ত শিশুগুলি তাহাদের ভূলুণ্ঠিতা মাতার চারিদিকে বসিয়া ঢুলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কে বহির্দ্বারের কড়ায় কটকট কটকট শব্দ করিল। হরিবাবু—অর্থাৎ সেই আত্মা, যাহা এতদিন হরিবাবু-নামচিহ্নিত দেহ আশ্রয় করিয়া ছিল,—ভাবিতে লাগিলেন, 'এমন সময় আবার কে আসিল ?' ঝি দরজা খুলিয়া দিল। হরিবাবু শুনিলেন সতীশ বাবুর মিষ্টমধুর কণ্ঠ। শুনিয়া চমকিত হইলেন।

সতীশবাবু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা, হরিবাবু আজ আপিসে জান নি, তাঁর কি কোনো অসুখ করেছে ? আমরা বড় চিন্তিত হ'য়ে খবর নিতে এসেছি।"

হরিবাবু শুনিয়া অবাক্। সতীশ, যাহাকে তিনি নিষ্ঠুর রাক্ষস-প্রকৃতির লোক মনে করিতেছিলেন, সে তাঁহারই জন্য চিন্তিত! আপিসের সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর, উজান রাস্তা বহিয়া আসিয়া তাঁহারই সন্ধান, তাঁহাদেরই কুশল প্রশ্ন ? সতীশের এই যে উদ্বেগ তাহা কি তাঁহাকে নিম্নতন কর্ম্মচারীরূপে আদেশ করিবার সুখে বঞ্চিত হইতে হইবে বলিয়া ?

ঝি সতীশবাবুর প্রশ্ন শুনিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাবু গো, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে' গেছে ; আমাদের বাবু স্বর্গে গেছেন।"

সতীশবাবু কাতর হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না। তাহার পর যখন নত মস্তক উঠাইলেন, হরিবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া শোকাশ্রুর মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইতেছে। হরিবাবু সতীশ বাবুকে মমতাহীন, পরসুখদলনকারী, নিষ্ঠুর রাক্ষস মনে করিতেছিলেন, কিন্তু এ কী যবনিকা উদ্ঘাটন! তিনি মনে করিতেন, তাঁহার সন্ততি ও স্ত্রী ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার অভাব অনুভব করিবে না। কিন্তু মৃত্যু কি মধুর! কত পরকে আপন করিয়া দেয়! কত দোষ ত্রুটি গোপন করিয়া ফেলে, বিস্মৃত করিয়া তুলে। যে সতীশবাবু তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চপদ গ্রাস করিয়াছিলেন, তিনি এখন হরিবাবুর জন্য দুঃখিত, ব্যথিত। তিনি যে আর মসীলিপ্ত ভাঙাটেবিলে বসিয়া 'লেজার' লিখিবেন না, ইহার জন্য আপিসের অন্ততঃ একজনও দুঃখিত—ইহা কি মধুর সুখদৃশ্য!

সতীশবাবুর যাওয়ার পর ঘণ্টা খানেক অতিবাহিত হইয়াছে। শিশুগুলি ভীতিবিহ্বল ক্ষুব্ধ চিত্তে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। দ্বারে একখানা গাড়ী আসিয়া লাগিল, এবং কড়া নাড়ার শব্দ উঠিল। ঝি গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। হরিবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন—লাহা বাবু স্বয়ং।

তিনি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিবাবু আজ আপিস যান নি কেন? অসুখ করেছে বুঝি? আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?"

ঝি কাঁদিয়া হরিবাবুর মৃত্যু সংবাদ জানাইল।

লাহা বাবু ওষ্ঠ দংশন করিয়া হৃদয়াবেগ দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বেশ বুঝা গেল। অনেকক্ষণ পরে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "এবার আমাদের আপিসের বড় দুর্দ্দিন। পুরাণো খাজাঞ্চি গেল, পুরাণো বড় বাবু গেল; মনে করেছিলাম, হরিবাবু আছেন, হায় হায়, হরিবাবুকেও আমরা হারালাম। আমাদের সর্ব্বনাশ দেখ্‌ছি।"

হরিবাবু বড় খুসি হইলেন। কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "সুবিচার করে খাজাঞ্চির পদটা আমায় দিলে, আমাকেও এত শীঘ্র মরতে হ'ত না তোমাদেরও পস্তাতে হত না। সবই অ-দৃষ্ট অদৃষ্ট!"

হরি বাবুর খুব ইচ্ছা হইতে লাগিল যে লাহা বাবুকে তাঁহাদের অবিচারের জন্য বেশ দুকথা শুনাইয়া দেন। কিন্তু মৃত আত্মার কথা জীবিত ব্যক্তিরা শুনিতে পায় না এবং আত্মার ক্রোধ করা অশোভন বলিয়া হরিবাবুর মনের সাধ মনেই থাকিয়া গেল।

সহসা হরিবাবু গায়ে কিসের আঘাত পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন তিনি মৃত বা মূর্চ্ছিত নহেন, সদ্য সুপ্তোত্থিত! বিন্দু তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে ঢুলিয়া পড়াতে পাখাখানা তাঁহার গায়ে গিয়া ঠেকিয়া ঘুম ভাঙাইয়াছে। লংসাহেবের গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢংঢং করিয়া দুইটা বাজিল, হরিবাবু চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন।

বিন্দু স্বামীকে সচেতন দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "খুব ঘুমিয়েছ। এখন কিছু খাও।"

হরিবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বড় ক্লান্ত হয়ে'

পড়েছিলাম, তাই এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি এখনো বসে' বাতাসই করছ! তুমি খেয়েছ?"

বিন্দু হাসিয়া বলিল, "প্রসাদের অপেক্ষায় আছি।"

হরিবাবু সস্নেহে সোহাগময়ী মৃদুহাসরম্যা পত্নীকে বুকে চাপিয়া ভাবসুখে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

২

পর দিন কিছু বিলম্বে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া তিনি ট্রামের উদ্দেশে ছুটিলেন। পত্নীর সহিত কোনো কথাবার্ত্তাই হইল না। বিন্দু দুঃখিত হইল। স্বামীর বিমনা হওয়ার কারণ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অজ্ঞাতই রহিবে। স্বামীকে উন্মনা দেখিয়া পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর বিষম ক্লেশ হইতেছিল। কারণ জানিয়া যদি প্রতিকার সম্ভব হয়, এই জন্য কারণ জানিতে বিন্দুর এত আগ্রহ।

হরিবাবু গত রাত্রের স্বপ্ন চিন্তা করিতে করিতে আপিসে গেলেন। আজ তাঁহার প্রসন্ন চিত্তে আশা ও আশ্বাস ভিন্ন নিরানন্দকর কিছু ছিল না। তিনি মনে করিতেছিলেন, সমস্ত সংসার কিছু তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বসিয়া নাই। যেমন করিয়া হোক, তিনি অবস্থার উন্নতি করিবেনই। এজগতে সকলে সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয় না। হয়ত কাঁহারো অর্থ আছে, স্বাস্থ্য নাই; কাহারো দুই আছে, পারিবারিক শান্তি নাই। অতএব মানুষ আপনার জীবনটি যেমনভাবে পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট সুখী থাকা উচিত। দৈনন্দিন জীবন হইতে যতখানি সম্ভব সুখশান্তি নিষ্কাসিত করিয়া লওয়াই

বুদ্ধিমানের কার্য্য। ষোল আনার অভাবে বারো আনাও ত্যাগ করা মূঢ়তা—মূর্খতা।

আপিসে পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। যাইতেই সতীশ-বাবু প্রভৃতি সাগ্রহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন। হরিবাবু প্রতিনমস্কার করিলেন; আংশিক স্বপ্নসাফল্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এই খাতিরের হেতু কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

হরিবাবু আপনার ভাঙা চেয়ারে ছারপোকার আক্রমণ নিবারণের জন্য একখানা খবরের কাগজ পাতিয়া বসিতে যাইবেন, এমন সময় সতীশবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "লাহা বাবু একবার আপনাকে খুঁজে গেছেন, আর আপনি এলেই খাস কামরায় পাঠিয়ে দিতে বলে গেছেন।"

হরিবাবু অধিকতর বিস্মিত হইয়া সংশয়াকুল চিত্তে বাবুদের কামরায় গেলেন।

তখন সাহাবাবু ও লাহাবাবু স্বচ্ছ কাচের গেলাসে বরফ লেমনেড চুমুকে চুমুকে পান করিতেছিলেন। হরিবাবুকে দেখিয়া লাহাবাবু বলিলেন, "দেখুন হরিবাবু, রামেশ্বর বাবু কাজে অবসর নিচ্ছেন। আমরা আপনাকে তাঁর পদে নিযুক্ত করেছি। আপনি তাঁর কাছে চার্জ্জটা বুঝে নেবেন। কাল আপনি সকাল সকাল বাড়ী চলে গিছলেন বলে' কাল আর আপনাকে বলতে পারি নি।"

হরিবাবু আনন্দ-বিহ্বল হৃদয়ে অভিভূত হইয়া কৃতজ্ঞতার কথা কিছুই বলিতে পারিলেন না। ভাবমুখর নির্ব্বাকদৃষ্টিতে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখন হরিবাবু বুঝিলেন, কেন তিনি খাজাঞ্চির পদ পান নাই। তিনি যে ম্যানেজার হইলেন! একেবারে শতমুদ্রা মাসিক আয় বৃদ্ধি! পৃথিবী এখন তাঁহার চক্ষে রামধনুর সপ্তবর্ণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই বিচিত্র বর্ণে তিনি দেখিলেন তাঁহারই বিন্দুর সন্তোষস্নেহের স্মিতহাস্য ও কাঞ্চনাভরণের বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ জ্যোতি!

বিন্দুকে কখন এই খবর দিয়া তাহার সুখপ্রদীপ্ত মুখখানি চুম্বনাচ্ছন্ন করিয়া দিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে হরিবাবুর আপিসের ঘণ্টা কয়টা কূর্ম্মমন্থর গতিতে কোনো মতে কাটিয়া গেল, সেদিন আর কোনো কাজ হইল না।

মৃত্যুমিলন

মুর্শিদাবাদের মোতিঝিলের পাড়ের উপর মোতিমহল। সিরাজ নবাবের বিলাসের জন্য একটি নূতন বেগম আমদানি হইয়াছে। সে থাকে সেই মোতিমহলের এক অংশে। তাহার নাম সমরু। সে শিরাজী। শিরাজ থেকে তাহার স্বামী মসরুরের সঙ্গে সে এদেশে আসিয়াছিল। মসরুর দুনিয়ার দৌলতখানা হিন্দুস্থানে নিজের দরিদ্রভাগ্য যাচাই করিতে আসিয়া তাহার একটিমাত্র যে রত্ন তাহাও হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে যখন বোরকা-ঢাকা সমরুকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উপার্জ্জন করিতে আসিল তখনই তাহার সর্ব্বস্বধন খোয়া গেল। সমরু গেল মোতিমহলে, আর মসরুর যে কোথায় গেল কে বা তাহার খোঁজ রাখে!

সমরু এখনো পোষ মানে নাই। নবাব সিরাজ তাহাকে পোষ মানাইবার জন্য চার চারজন অভিজ্ঞ বাঁদি নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সমরু বড় বেয়াড়া মেয়ে। সমস্তদিন সে বাঁদিদের বকবকানি নীরবে সহ্য করে কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলে সে আর কাহারো নয়। সে সকলকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের মহলে কপাট দেয়; কেহ যাইতে অস্বীকার করিলে উদ্ধত ফণিনীর মতো উদ্যত হইয়া উঠে।

মোতিঝিলের এক পাড়ে মোতিমহল, আর এক পাড়ে ধানের ক্ষেত। ভাদ্রমাসের শেষাশেষি। বর্ষা বিদায় লইয়াছে; শরতের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল হাসিতে ভুবন ভরিয়া উঠিয়াছে। সমরু মোতিমহলের খোলা জানলার ধারে ম্লান দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত, ধানে ধানে ক্ষেতগুলি একটানা সবুজে ভরিয়া গিয়াছে, যতদূর চোখ চলে শুধু সবুজ আর সবুজ। কোথাওকার রং টিয়াপাখীর গায়ের মতো, কোথাও বা পান্নার মতো, কোথাও বা গাঢ়, কোথাও তরল,—একই সবুজের বিচিত্র বিকাশ। ধান গাছের তলে তলে কোথাও থিতানো স্বচ্ছ জল তক তক করিতেছে, ধানগাছগুলি মাথা নুয়াইয়া ঘাড় নাড়িয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া যেন আয়নায় মুখ দেখিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দমকা হাওয়া ফিরোজা রঙের ওড়নাখানির আঁচলের মতো ধানের ক্ষেতটাকে ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যাইতেছে। এই ধূ ধূ মাঠের মধ্যে যতদূর চোখ যায় কোথাও একটি গাছ নাই; কোথাও একটি জনপ্রাণী নাই। শুধু ক্ষেতের মাঝে মাঝে খুব উঁচু উঁচু টং বাঁধিয়া টোকামাথায় চাষারা বসিয়া বসিয়া ধানের শত্রু পাখী তাড়াইতেছে।

মোতিঝিলের ঠিক ওপাড়ে মোতিমহলের ঠিক সামনে একটা যে টং সেটা একটু বেশি উঁচু। সেই টঙের আগলদার টোকা মাথায় দিয়া মোতিমহলের জানলার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়া থাকিত। সমরু দেখিত। কিন্তু সে সেই চাষাটার দৃষ্টি এড়াইয়া সরিয়া যাইত না।

জানলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আগলদারের সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যা হইলে সে রেড়ির তেলে একটি মিটমিটে চেরাগ জ্বালিয়া একটা লম্বা বাঁশের খোঁটায় টাঙাইয়া দিত। আর সমরুও শামাদানের আলোটাকে জানলার উপর তুলিয়া রাখিত। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যখন চোখের আলো নিভিয়া আসিত, তখন দুটি আলো তাহাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হৃদয়ের সকল স্নেহ জ্বালাইয়া পুড়াইয়া সমস্ত বিভাবরী জাগিয়া কাটাইত।

সন্ধ্যার পর যখন দেউড়ীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিত; যখন মসজিদে মসজিদে আজান দিয়া ডাকাডাকি পড়িত; তখন টঙের উপর থেকে চাষার বাঁশি সাহানার কাঁদুনি সুরে কি এক অব্যক্ত হৃদয়বেদনায় সমস্ত ক্ষেতটাকে ভরিয়া তুলিত; আর সমরুও অমনি নিজের এসরাজটিতে তার বাঁধিয়া সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলাইত।

এমন করিয়া দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন হয়। হঠাৎ একদিন সমরু বেগমের ঘুড়ি উড়াইবার সখ হইল। বেগমের সাধ, তাহাতে আবার নূতন বেগম,—রংবেরঙের হররকমের ঘুড়ি লাটাই তাহার পায়ের তলায় হাজির হইয়া লুটাইতে লাগিল। বেগম সাহেবার পাতলা কাগজের হাল্কা ঘুড়ি বেগম সাহেবার হৃদয়-

তগের রক্ততালে নাচিয়া নাচিয়া ফর ফর করিয়া সেই চাষার টঙের দিকে রোজ রোজ ভাসিয়া যায়। ইহা দেখিয়া চাষারও ঘুড়ি উড়াইবার সখ হইল। তার পর হইতে অনেক সময় গোঁত্তা খাইয়া চাষার ঘুড়ি সমরুর বুকের উপর চুম্বন করিয়া ফর ফর করিয়া উড়িয়া পলাইত; কখনো বা সমরুর ঘুড়ি চাষার ঘুড়িকে শতপাকে আলিঙ্গন করিয়া পেঁচ লড়িত! একদিন সমরু চাষার একখানা ঘুড়ি কাটিয়া লুটিয়া লইল। সেই ঘুড়ির গায়ে দিব্য গোল গোল ছাঁদে তুলি দিয়া লেখা আছে—

> সব্‌র্ কুন্ হাফিজ্‌ বসখ্‌তি রোজ্‌ ও শব্।
> আকিবৎ রোজি বিয়াবি কাম্-রা।

(ওগো হাফিজ, দুঃখের দিনে দিবারাত্রি ধৈর্য্য ধরিয়া থাক; সৌভাগ্যের দিনে কামনা তোমার পূর্ণ হইবে।)

ঘুড়ির বুকে লেখা কবিতাটি পড়িতে পড়িতে সমরুর চোখে কি পড়িল, সে ওড়না দিয়া বড় ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

এমনি করিয়া দিনে ভাবিয়া রাতে জাগিয়া সমরুর পুষ্প-পেলব দেহখানি দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে ধানক্ষেতের আগলদারও রৌদ্রবর্ষা মাথা পাতিয়া সহিতে সহিতে রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন জলা ভুঁয়ের স্যাঁতা মাটি হইতে জ্বর উঠিয়া চাষাকে হিম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খুব করিয়া নাড়িয়া দিল, দগ্ধকরা ফুৎকার দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাইয়া দিতে লাগিল।

সেদিনও চাষা অনেক কষ্টে তাহার ঘুড়িখানা উড়াইল বটে কিন্তু ঘুড়ি আকাশে থাকিল না, ধানক্ষেতের কাদার মাঝে

লুটাইয়া পড়িল। সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রমালা জ্বলিয়া উঠিল, মোতিমহলের বাতায়নে শামাদান জ্বলিল, কিন্তু চাষার টঙে সেদিন আর আলো জ্বলিল না। সমরু বাতিদান দুলাইয়া দুলাইয়া কত ডাকিল, টং হইতে কেহ তাহার জবাব দিল না। সমরুর এসরাজ গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই ধানক্ষেতের আগলদারকে বার বার ডাকিল; টঙের উপর আগলদারও বাঁশিতে ফুঁ দিল কিন্তু আজ সে ফুঁ বাজিল না। সমরু বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার প্রবহমান অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে টঙের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। শরতের পূর্ণিমা। সোনার ধানের উপর সোনার জ্যোৎস্নার প্লাবন চলিয়াছে। টং প্রেতের মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমরু আর থাকিতে পারিল না—"মসরুর মসরুর তুমি কোথায় গেলে, তোমার কি হল" বলিয়া মেঝে-মোড়া চার-আঙুল-পুরু পারস্যের গালিচার উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মসরুর টঙের উপর পড়িয়া পড়িয়া মনে করিতে লাগিল সে যেন পরী। চাঁদের আলোর মতো জরদা রঙের দুখানা ঘুড়ির ডানা মেলিয়া সে যেন নীল আকাশে পাড়ি দিয়াছে। তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া সমরুর কণ্ঠমিশ্রিত এসরাজের সুর নাচিতেছে, আর হেনা বকুলের মিশ্রগন্ধ সেই সুরে তাল দিতেছে। আকাশের বুকের উপর পূর্ণিমার গোল চাঁদখানা তর তর করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যেন তাহারই দিকে আসিল। সেটা যেন চাঁদ নয়, সেখানি সমরুর মুখ! নিকটে, নিকটে, আরো নিকটে সমরুর চাঁদমুখ-খানি সরিয়া আসিল। সমরুর কালো কালো সুর্মা-আঁকা চোখ দুটির দীর্ঘ পক্ষ্মরাজির পেলবস্পর্শ সে নিজের

কপোলের উপর অনুভব করিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজের হাত দুখানি তুলিয়া মসরুর মুখখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

পরদিন প্রভাতে চাষারা দেখিল একটা সুতো বরাবর মসরুরের টং হইতে মোতিমহল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া রহিয়াছে। ভয়ে ভয়ে চাষারা নবাব-দরবারে খবর দিল। নবাব সিরাজ টঙে গিয়া দেখিলেন একটা শিরাজী একখানা জর্দা রঙের ঘুড়ি দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মরিয়া পড়িয়া আছে, আর সেই ঘুড়িতে নূতন বেগমের মুখ আঁকা!

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া নবাব হুকুম দিলেন, "নকল কেন, আসলটাই ঐ সঙ্গে কবরে দাও।"

সদানন্দের বৈরাগ্য

বাপমায়ে বড় সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল সদানন্দ। পাড়ার দুষ্টলোকেরা তাঁহাদের স্নেহের ভুলটাকে সংশোধন করিয়া তাহাকে নিরানন্দ বলিত।

সে ছেলেবেলা হইতেই কেমন অনাবশ্যক গম্ভীর। শৈশবে সে 'তাই তাই' করিয়া হাসে নাই। বাল্যে পাঠশালায় গিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করে নাই। এজন্য তাহার সহপাঠীরা তাহাকে গুরুমশায় বলিত। এখন সদানন্দ যৌবনপথের অনেকখানি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এখন ত তাহার না হাসিবারই কথা।

সদানন্দ হাসে নাই, কিন্তু তাহার যথারীতি বিবাহ হইয়াছে;

এবং গুটিকত শিশুর কলকাকলিতে তাহার গৃহ মুখর হইয়া উঠিতেছে।

এইসব ব্যাপারগুলা সদানন্দের জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইতেছিল না। প্রথম, বিবাহ ব্যাপারটাই তাহার গাম্ভীর্য্যের প্রতি নিষ্ঠুর উপহাস—বাপমায়ের দারুণ ষড়যন্ত্র। ছাদনাতলায় শালাশালীতে কান মলিয়া, বাসরঘরে বিদ্রূপ করিয়া, কথায় কথায় ঠকাইয়া সদানন্দের গাম্ভীর্য্যকে টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছিল।

স্ত্রীটি ত অপরিবর্জ্জনীয় উপদ্রব। খাও দাও থাক; তা না, তাঁহার আবার সখ কত! হাসি চাই, ঠাট্টা চাই, রসিকতা চাই। সদানন্দের প্রাণ এই এক কোথাকার-কে উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা অত্যাচারীর উৎপাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। বেচারার বারবার মনে হইত—

"স্ত্রীর চাইতে কুমীর ভালো
বলে সর্ব্ব শাস্ত্রী।
কুমীর ধরলে ছাড়ে তবু,
ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।"

বিবাহের দুচার বছর পরেই স্ত্রীটি নূতনতর উপদ্রবের পন্থা আবিষ্কার করিল। বছরে একটি করিয়া শিশুর আমদানীতে ঘর ভরিয়া ফেলিবার উপক্রম! শুধু কি তাই! শুধু তাই হইলেও ত সদানন্দ বাঁচিত। শিশুগুলা আবার হাসে! তাহারা নাচে, গায়, বত্রিশ রকম মুখভঙ্গী করে, সদানন্দের ভীষণ গম্ভীর শ্মশ্রুবহুল মুখ দেখিয়া একটুও ভয় করে না, বরং তাহাদের আক্রোশ দাড়ির উপরেই অধিক। এইসব দেখিয়া শুনিয়া সদানন্দের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

গাঁয়ের লোকেরাও কি কম উৎপাত করে! তাহারা সদানন্দের অমন গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র খাতির না করিয়া কেহ বা তাহার মাথায় চাঁটি মারে, কেহ বা গায়ে হুঁকার জল ঢালিয়া দেয়, কেহবা তাহার দাড়ি ধরিয়া টানে।

বাল্যাবধি লোকের অভদ্র উৎপাতে সদানন্দ মনে মনে ভারি বিরক্ত হইতেছিল। ক্রমে তাহার গৃহ যখন পাঁচ ছয়টি শিশুর ক্রন্দন কোলাহল আব্দারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন একদিন সদানন্দ "ধুত্তোর" বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

সে গৃহ ছাড়িল, অদৃষ্ট কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না।

সদানন্দ চায় বেশ একটি নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে সে আপনাকে লইয়া গুম হইয়া জীবনটা কাটাইয়া দেয়। তাহার ভাগ্যবিধাতা কিন্তু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন অন্যরূপ। দূর হইতে পর্ব্বতের গুহা, গহন বন মনের মধ্যে বেশ একটা বিরাট রকমের ভাবসঞ্চার করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেগুলার মধ্যে কবিত্বের অংশটা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। গুহার মধ্যে কাঁকর বা বনের মধ্যে ফলপাকড় খাইয়া ত জীবনটাকে অধিক দিন ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ক্ষুধা জিনিষটা সদানন্দের অতবড় গাম্ভীর্য্যকে যে একেবারেই ভয় করিত না।

সুতরাং সদানন্দকে লোকালয় ঘেঁষিয়াই এক গ্রামের সুদূর প্রান্তে একখানা কুঁড়ে বাঁধিতে হইল। আঃ! সেখানেও কি কম জ্বালাতন! হাটের ব্যাপারী লোকগুলা তাহারই কুটীরে গিয়া তামাক খাইবার আগুন চায়, কৃষকেরা গান গাহিয়া শান্তিভঙ্গ করে, ভবঘুরে ছেলেগুলো মরিবার আর জায়গা না পাইয়া তাহারই কুটীরের চারিদিকে ঘুরপাক খায়!

আহারের সঞ্চয়ের জন্য মাঝে মাঝে তাহাকেও গ্রামে ঢুকিতে হয়। সেখানেও কি যত জঞ্জাল! গ্রামের কুকুরগুলা খেউ খেউ করিয়া তাহাকে নাচাইয়া তুলে, ছেলেগুলা সেই সঙ্গে হাততালি দিয়া ক্ষেপাইয়া দেয়, মেয়েরা পর্য্যন্ত ঘোমটার আড়াল হইতে সন্ন্যাসী মিন্‌সের নাকাল দেখিয়া কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসে—অত বড় গাম্ভীর্য্যটাকে একটুও গ্রাহ্য না করিয়া সকলে মিলিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলে।

সদানন্দের সে গ্রামে আর বাস করা পোষাইল না। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক গ্রামের বাহিরে তেপান্তর মাঠে শ্মশানের মাঝে আপনার আস্তানা গাড়িল।

শ্মশানডাঙায় কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে আসিত না। কালেভদ্রে শব-সঙ্গীরা তাহার কুটীরে আশ্রয় লইত, প্রতিদানে যাহা দিয়া যাইত সদানন্দের তাহাতেই কোনো রকমে দিন-গত পাপক্ষয় হইত।

এখানে সদানন্দ এক রকম মনের সুখেই নিশ্চিন্ত ছিল। বেচারার ভাগ্যবিধাতা কিন্তু তখনো নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

একদিন কয়েকজন লোক একটি শব সৎকার করিতে শ্মশানে আসিয়াছে। ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি শবটাকে আনিয়া সদানন্দের কুটীরের বাহিরে রাখিল এবং অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই সদানন্দের কুটীরের মধ্যে ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

ছোট কুটীর। তাহার মধ্যে পাঁচ ছয় জন লোক ঢুকিয়া জটলা কলরব আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দের তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার উপর তাহারা তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী

পাকাইয়া সদানন্দ বেচারাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সদানন্দ আস্তে আস্তে পাশ কাটাইয়া কুটীরের দ্বারের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে। শব বাহিরে পড়িয়া ভিজিতেছে। সদানন্দ তাহাই দেখিতেছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, শব যেন একটু নড়িল। দানায় পাইল নাকি!

সদানন্দ ভয়ের বড় একটা তোয়াক্কা রাখিত না, রাখিলে কি শ্মশান আপনার বাসস্থান বলিয়া বাছিয়া লইতে পারে? সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোমবহুল ঝাঁপালো ভ্রূর তলদেশ হইতে চক্ষু চাড়িয়া দেখিতে লাগিল বাস্তবিকই শব নড়িতেছে। যাহারা শব আনিয়াছিল তাহারা ঘরের ভিতরে আপন মনে ধূমপানে ও গল্পজল্পনায় মত্ত ছিল, আর সদানন্দ ছিল দ্বার আগুলিয়া; তাহারা বাহিরের ব্যাপার কিছুই জানিতেছিল না।

সদানন্দ যখন দেখিল যে শব স্পষ্টই নড়িতেছে তখন সে কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শববাহী একজন বলিল "কি ঠাকুর, জলে ভিজে কোথায় যাও।"

সদানন্দ কোনো উত্তর দিল না। শবের কাছে গিয়া মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিল। শব তখন চক্ষু মেলিয়াছে, আর বৃষ্টিধারা হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া পান করিতেছে। সদানন্দ শবের ম্যাচকা ধরিয়া হড় হড় করিয়া কুটীরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। শববাহীরা কোলাহল করিয়া আপত্তির স্বরে বলিল "একি ঠাকুর, ওটাকে আবার এর মধ্যে ভরছ কেন?"

সদানন্দ এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া শবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল শব চেতনা লাভ করিয়া

উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সকলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক আড়ষ্ট হইয়া গেল। সন্ন্যাসীবাবা সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার পুণ্যস্পর্শে মৃত শব সঞ্জীবিত হয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাহাদের রোমাঞ্চ হইল। সকলে ভক্তিভরে মহাপুরুষের পায়ের ধুলা মাথায় লইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট হইয়া গেল সন্ন্যাসী মরা মানুষ বাঁচাইতে পারেন। গাঁ ভাঙিয়া রাজ্যের নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা সদানন্দের কুটীর ঘিরিয়া ভিড় জমাইয়া তুলিল। পীড়িতের আত্মীয় স্বজন সভক্তি কৃতজ্ঞতায় সদানন্দের চরণে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সদানন্দের খ্যাতি দাবানলের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতিদিন কত দেশের বাসি মড়া, গলিত কুষ্ঠ আসিয়া তাহার দ্বারে ধন্না দিতে লাগিল। শ্মশানডাঙায় মেলা বসিল, দোকান পসার হাটে জমজমাট। কত দেশের কত লোক কত রকম মানসিক করিয়া সন্ন্যাসীবাবার চরণে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সদানন্দের কোনো পুরুষে কেহ বৈদ্য ছিল না, অথচ বেচারাকে ঘিরিয়া দুনিয়ার রোগীর সনির্ব্বন্ধ করুণ প্রার্থনা দিবানিশি ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সদানন্দ যত সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে তাহার বাস্তবিক কোনো দৈব ক্ষমতা নাই, সে সিদ্ধপুরুষ বা যোগী মোটেই নহে, সে একজন অতি সাধারণ রকমের সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী, লোকের ভক্তি আগ্রহ ততই বাড়িয়া চলে। সকলে বলাবলি করে, “দেখেছ, বাবাঠাকুরের মহিমে! আজকালকার দিনে লোকে পসার জমাবার জন্যে কি না করে? কিন্তু বাবা খাঁটি মহাপুরুষ

কিনা, তাই ধরা দিতে চান না। কিন্তু বাবা ধরা ত পড়েছ, ভক্তকে ভাঁড়াতে আর পারছ না। তোমাকে ওষুধ দিতেই হবে। যতদিন ওষুধ না পাব শ্রীচরণ আঁকড়ে পড়ে থাকব। দয়া তোমাকে করতেই হবে বাবা!"

শ্রীচরণ দুখানিকে অসংখ্য ভক্তের সাগ্রহ আক্রমণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নাচার হইয়া সদানন্দ হাতের মাথায় যাহা পায় তাহাই ঔষধ বলিয়া বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল। আর সকলে তাহাই ভক্তিভরে সেবন করিতে কিংবা মাদুলী করিয়া ধারণ করিতে লাগিল। অনেকের রোগ বিশ্বাসের জোরেই সারিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বাবার খ্যাতি প্রতিপত্তিও বাড়িয়াই চলিল। যাহাদের রোগ সারিল না তাহারা দ্বিগুণ আগ্রহে সদানন্দের চরণ চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল "হে বাবাঠাকুর, কি পাপ দেখে আমার ওপর দয়া হল না বাবা!"

সদানন্দ বেচারা ভক্তির আতিশয্যে উত্যক্ত হইয়া উঠিল। সে সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া বিশ্ববিধাতা আজ সারা সংসার ডাকিয়া তাহারই কুটীরদ্বারে আনিয়া হাজির করিয়াছেন! এ কী ভীষণ শাস্তি! সদানন্দ দেখিল এর চেয়ে সে নিজের গ্রামে নিজের গৃহে ঢের শান্তিতে, ঢের আরামে ছিল। অবশেষে তাহার বৈরাগ্যের উপর বৈরাগ্য আসিল।

একদিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিল—বাবা সিদ্ধপুরুষ অন্তর্ধান করিয়াছেন। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। সিদ্ধপুরুষের অন্তর্ধানে সরগরম শ্মশানডাঙা ক্রমে ক্রমে আবার শ্মশান হইয়া গেল।

চায়া-ওন্না

আমি যখন জাপানে যা-হোক-একটা-কিছু শিখিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম তখন আমার হিতৈষী অভিভাবকগণ অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন ; আমিও নিজে নিজের সাফল্যের প্রতি যে বিশেষ আস্থাবান ছিলাম তাহা বলাই বাহুল্য।

একদিন প্রত্যুষে ইডেন গার্ডেনের ঘাট হইতে যখন জাহাজে চড়িলাম তখন সেই প্রভাতেরই কনক রৌদ্রের মতো আমার ভবিষ্যৎ বড় সুন্দর বড় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। আগাগোড়া শুধু সফলতা, শুধু জয়। তাই যখন বন্ধুজনের বিরহবেদনা পাথেয় লইয়া জাহাজ কোন সেই অচেনা অজানা সুদূরের উদ্দেশে যাত্রা সুরু করিল, তখনো আমার মুখ নিষ্প্রভ হইয়া গেল না।

কত অপূর্ব্ব দেশ, বিচিত্র মানব, চমৎকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সাগরবক্ষে নাচিতে নাচিতে আমার আশার নন্দন জাপানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

একদিন যখন দূর হইতে জাপানী নাবিকেরা স্বদেশের অয়শ্চক্রনিভ তটরেখা দেখিয়া সমস্বরে "বান্‌জাই" বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন আমার চিত্ত প্রথম-প্রণয়-সম্ভাষণ-ভীরু নবোঢ়া বধূর মতো চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমাদের জাহাজ জাপানের য়োকোহামা বন্দরে গিয়া লাগিল। আমি সেখানেই নামিলাম। এই সহরে দুদিন বিশ্রাম করিয়া তারপর ট্রেনে তোকিয়ো যাইব।

একটি হোটেলে আশ্রয় ঠিক করিয়াই সহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সমস্ত দেশটা যেন স্বপ্নের মতো, মায়ার মতো, কল্পনার মতো'; বাড়ীগুলি যেন ছবি, মানুষগুলি যেন পুতুল, কারবার যেন কলের। রাস্তায় আবর্জনা নাই, গোলমাল নাই, গাড়ীঘোড়ার হুড়াহুড়ি নাই। পথিকেরা শান্ত, মানুষটানা রিক্‌শা গাড়ীগুলিও নিঃশব্দ; সমস্ত সহরটি যেন তন্দ্রাবেশে আচ্ছন্ন, এমনি একটা মোহময় স্তব্ধতা সর্ব্বত্র বিরাজিত।

যাহা দেখি তাহাই আমার চক্ষে নূতন ঠেকে। আমার কাজ ছিল না, চাথিয়া চাথিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিয়া লইতেছিলাম।

দোকানগুলি ফিটফাট, শিল্পকলার লীলানিকেতন। এক একটা দোকানের কাছে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল। যে দোকানগুলি দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ সেগুলিও সুন্দর, আবার যেগুলি রিক্ত সেগুলিও চমৎকার,—তাহাদের শূন্যতা মনকে শান্তি দেয়, কিন্তু চক্ষুকে পীড়া দেয় না।

এমনি একখানি আসবাবহীন দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাহার রিক্ত সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, এমন সময় আমায় চমকিত করিয়া কাহার মধুসম্ভাষণ আমাকে অভিনন্দন করিল—দায়া মুকায়্রু! (আসিতে আজ্ঞা হোক মহাশয়!)

আমি চেতনা পাইয়া দেখিলাম আমি একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছি। একটি তরুণী তাহার হাত দুখানি দুই উরুর উপর রাখিয়া একটু নত হইয়া আমাকে তাহার দোকানে অভ্যর্থনা করিতেছে—দায়া মুকায়্রু!

সে স্বরে কী ভব্যতা, কী বিনয়! অভ্যর্থনার সে কী

সরস ভঙ্গী! আমার কোনো পুরুষে চায়ের ধার ধারে না, তবু এমন তরুণীর এমন আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। চায়াতে (চায়ের দোকানে) প্রবেশ করিলাম।

তরুণী চায়া-ওয়া (চা-ওয়ালী) অমনি আমার সম্মুখে আসিয়া দুই উরুতে হাত রাখিয়া ঈষৎ অবনত হইয়া দাঁড়াইল; তারপর সরলভাবে দাঁড়াইয়া একখানি চেয়ার টানিয়া দিয়া বলিল—ও কাকে নাসাই! (বসিতে আজ্ঞা হোক!)

আমি চেয়ারে বসিলাম। তরুণী চায়া-ওয়া পুতুল-বাজির পুতুলের মতো নিঃশব্দে চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তেক পরে এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সামনে একটা সেপায়ার উপর রাখিল; আর আনিল একটা রেকাবে করিয়া খানকতক সাকুরা-মোচি (চেরিফুলের পিঠে)।

চীনে মাটির শুভ্র স্বচ্ছ পেয়ালার গায়ে ঈষৎ হরিতাভ চায়ের ক্ষীণ আভাসটুকু সেই তরুণীরই কপোল দুটির অনুকরণ করিতেছিল; চেরিফুলের পিঠেগুলির বুকের মাঝে যে মৃদু ঘ্রাণ তাহা সেই তরুণীরই অন্তরখানির আভাস দিতেছিল।

আমি চায়ের পেয়ালাটিতে অধর স্পর্শ করিয়া চুমুকে চুমুকে সুগন্ধি চা আর তারই মাঝে মাঝে সাকুরা-মোচি আস্বাদন করিতে লাগিলাম। কিন্তু চোখ দুটা আমার নিবিষ্ট হইয়াই ছিল সেই তরুণীর তনুলতায়।

সে ঠিক যেন একটি রজনীগন্ধা ফুল—তেমনি তন্বী, তেমনি শুভ্র, তেমনি নিটোল, তেমনি কোমল, তেমনি মধুর! তাহার মাথায় ফাঁপানো খোঁপা। পরণে চিত্রবিচিত্র কিমোনো (জাপানী

পোষাক), যেন একটি প্রজাপতি তাহার বর্ণবহুল ডানা মেলিয়া রজনীগন্ধার গায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আমি দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেছিলাম।

অনেক বিলম্ব করিয়াই চায়ের পেয়ালা শেষ করিলাম। তখন আর অপেক্ষা করিবার কোনো ছুতা খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা উঠিতে হইল। চায়ের দাম শোধ করিয়া দিতেই তরুণী অতি মোলায়েম কণ্ঠে বলিল—আরিগাতো! (ধন্যবাদ!)

ইহার উত্তরে আমার কি বলা উচিত ঠিক করিতে না পারিয়া আমি একটু হাসিয়া মস্তক নত করিলাম। সে হাসিতে আমার প্রাণের সমস্ত তরলতা ঢালিয়া দিয়া তরুণীকে বুঝিতে দিলাম—আমি বিদেশী, আমার মুখে ভাষা নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সমাদর করিতে পারি এমনতর সরস প্রাণ একখানি এই কালো চামড়ার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে।

আমি বাহির হইয়া আসিতেছি, তরুণীও আমার সঙ্গে সঙ্গে চায়ার দ্বার পর্য্যন্ত আসিল এবং আবার তাহার কণ্ঠস্বরে জগতের সকল মাধুর্য্য মিশাইয়া সে বলিল—সায়ো নারা! আরিগাতো গোজাইমাশ্, মাতা নেগাইমাস্। (বিদায়! ধন্যবাদ মহাশয়! আবার অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন!)

সুন্দরী কি বলিল কিছুই বুঝিলাম না; শুধু ভাবে বুঝিলাম সে বলিল—হে বন্ধু, আজিকার মতন বিদায়; কিন্তু এ বিদায় যেন শেষ বিদায় না হয়, আবার এসো বন্ধু, আবার এসো!

আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া আসিলাম।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত মানুষ আছে, তাহার মধ্যে এক-একজনের সঙ্গে কেমন ক্ষণে দেখা হয় যে তাহাকে আর কিছুতেই ভুলিতে

পারা যায় না। সে যে সৌন্দর্য্যের মোহ বা নূতনত্বের মাদকতা ঠিক তা বলা যায় না। প্রাণটা যেন এতদিন তাহারই প্রতীক্ষায় বিরহবেদনা ভোগ করিতেছিল, তাহারই মিলনে হৃদয় মন ভরিয়া উঠে, জীবন ধন্য বোধ হয়।

সামান্য একটি চায়া-ওন্নাকে দেখিয়া আমার প্রীতির সাগর যেন উছলিয়া উঠিল; তাহার কোমল রূপ, মধুর বাণী, ললিত ভঙ্গী, সরস সঙ্গ আমার অন্তর যেন ভাবে আনন্দে ভরিয়া ছাপাইয়া তুলিল।

মাত্র দুদিন য়োকোহামায় থাকার কথা। এই দুদিনে যতবার পারি তাহাকে দেখিয়া আমার আকুল অন্তরটাকে তৃপ্ত করিয়া লইব ঠিক করিলাম।

সন্ধ্যাবেলা আবার চায়াতে গেলাম। তরুণী আমায় দেখিয়া তাহাদের দেশের রীতি অনুসারে দুই উরুতে হাত রাখিয়া ঈষৎ নত হইয়া মধুরকণ্ঠে আমাকে অভ্যর্থনা করিল—কোম্বান ওয়া। (শুভ সন্ধ্যা!)

তাহার মুখে হাসির রেখামাত্র ছিল না, কণ্ঠে প্রকম্প ছিল না, কিন্তু তার ছোট টানা বাঁকা চোখ দুটি আমার সাক্ষাৎ-লাভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। আমিও তাহাকে শুভ সন্ধ্যা জ্ঞাপন করিলাম।

রাত্রে হোটেলে ফিরিলাম, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল সেই চায়ের দোকানে। একটি সাকুরা ফুলের মতো ছোট অথচ পরিপূর্ণ-যৌবনার স্মৃতিটিকে শতপাকে বেষ্টন করিয়া আমার চিত্ত ভ্রমরের মতো গুঞ্জরণ করিতেছিল। এই বিদেশিনীর সকল কথা আমি বুঝি না, আমার একটা কথাও তাহাকে বুঝাইতে পারি না।

কিন্তু এই ভাষাহীন ভাষার অন্তরালে যে কল্পনা যে ভাবপুঞ্জ জমিয়া উঠিতেছিল তাহা বিচিত্র, তাহাই আমার অন্তর বাহির পুলকাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল।

সমস্ত রাত্রি চায়া-ওন্নাকেই স্বপ্ন দেখিলাম। প্রভাতে তাহাকে স্মরণ করিয়াই নয়ন মেলিলাম।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া চায়ার দিকে চলিয়া গেলাম। তখনও প্রভাতের আলো ভালো করিয়া ফুটে নাই, চায়ার দরজা খুলে নাই। মুদ্রিত কমলের চারিদিকে ব্যস্ত ভ্রমরের প্রবেশ যাচনার মতো ব্যাকুল চিত্তে আমি চায়ার সম্মুখে পদচারণা করিতে লাগিলাম। প্রভাতে দ্বার খুলিল। তরুণী চায়া-ওন্না আমাকে দ্বারের কাছে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ও হায়ো! (সুপ্রভাত!)

আমিও তাহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া মনে মনে বলিলাম—প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমুখ দেখিনু, দিন যাবে ভাল ভাল!

দুটি দিনেই আমরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলাম। আমি বুঝিলাম এই তরুণী আমারই জন্য জগতে আসিয়াছে, আর এই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুদূর জাপানে ইহারই সহিত মিলনের জন্য আমার এই অভিসার—বিদ্যার জন্য নয়, খ্যাতির জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়—এ আমার প্রেমযাত্রা!

দুদিন গেল। তবু আমার তোকিও যাওয়া হইল না। মনে করিলাম য়োকোহামাতেই কোনো কালেজে বা কারখানায় কিছু একটা সুরু করিয়া দি, তারপর কিছু দিন পরে তোকিও গিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলেই হইবে। কিন্তু সব প্রথমে এ

দেশের ভাষা শিক্ষা করা দরকার এই শিক্ষাটুকু আমি চায়া-ওয়ার কাছেই প্রথম লাভ করিলাম।

হোটেলের ম্যানেজারকে বলিলাম আমায় একজন এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিন যে ইংরেজি জানে আর আমাকে জাপানী শিখাইতে পারে। ম্যানেজার একজনকে আনিয়া দিল। লোকটি গাকুশা অর্থাৎ পণ্ডিত।

আমি প্রথমেই তাঁহার কাছে প্রেমের পাঠ লইতে আরম্ভ করিলাম। প্রণয়ের অভিধানে যে কথাগুলার খুব চলন সেগুলাই বাছিয়া বাছিয়া আমি গাকুশার কাছে প্রথমেই তর্জ্জমা করিয়া শিখিয়া লইতে লাগিলাম।

লোকটাও বেশ রসিক আর প্রণয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমি যেমনটি চাই ঠিক তেমনি করিয়াই আমাকে তালিম করিতে লাগিল।

একদিন গাকুশা হাসিতে হাসিতে আমায় জিজ্ঞাসা করিল—কিহে বিদেশী ছাত্র! নিপ্পনের মাটিতে পা দিতে না দিতে প্রেমে পড়লে না কি?

হাঁ সেন্‌সেই (গুরুমশায়)।

কেমন সে তরুণী?

যেন একটি সাকুরা হানা (চেরি ফুল) গাকুশা!

কোথায়, কোথায় এমন নিধি মিল্‌ল?

কেবল সেইটি বলব না, গাকুশা!

গাকুশা একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা না-ই বললে। আমি তোমায় প্রণয়ের ভাষায় তালিম করে দেবো, যেন শীঘ্র সফল হও। বিবাহের দিন আমায় নিমন্ত্রণ করতে ভুলো না যেন।

এমনিতর পরের কাছে নিজের ভাব তর্জ্জমা করিয়া লইয়া মুখস্থ ভাষায় আমার প্রণয় বেশ অগ্রসর হইতে লাগিল। গাকৃশার সহিতও একটি বেশ সরস বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল। ক্রমে জানিলাম সেও একজন নূতন প্রণয়ী, তাহারও নাকি একটি ছোট প্রণয়িনী আছে, হাস্নুনো হানার মতো স্নিগ্ধ সে, তাই গাকৃশা আমার ঠিক উপযুক্ত শিক্ষক হইতে পারিয়াছিল।

এমনি করিয়া অনেক দিন গেল। একদিন গাকৃশা আমায় পড়াইতে আসিয়া খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—বন্ধু, বন্ধু, তুমি ধরা পড়ে গেছ!

আমি ব্যাপার কতকটা আন্দাজ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম—কি গাকৃশা, কি?

গাকৃশা আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—চায়া-ওন্না তোমার প্রণয়িনী তা এত দিন আমায় বলতে হয়। আজ হঠাৎ ঐ পথে যেতে তোমাদের মিলন-মশ্‌গুল্ ভাব দেখে আমি আন্দাজ করে নিলাম। একথা আমায় আগে বলতে হয়—তাহলে তোমাকেও এত পাঠ মুখস্থ করতে হত না, আমাকেও এত বেগ পেতে হত না। একটি মন্ত্রে সব ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি হয়ে যেত।

আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম—কি গাকৃশা, সে মন্ত্রটি কি?

এস তোমায় শিখিয়ে দি—বলিয়া গাকৃশা সে দিন অনেক যত্নে আমায় নূতন রকমের কতকগুলি কথা মুখস্থ করাইল। তারপর বলিল—এই কথা শুনলে চায়া-ওন্না একেবারে মুগ্ধ হয়ে একান্ত তোমারি হয়ে যাবে।

এই কথা বলিয়া গাকৃশা খুব হাসিতে লাগিল।

অতিরিক্ত ঔৎসুক্য ও আনন্দের বশে সে দিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতে না ঘনাইতে আমি চায়াতে গেলাম। যথারীতি অভিবাদন ও চা পানের পর আমি চায়া-ওয়াকে খুব নিকটে টানিয়া বসাইলাম—সেই ছোট মানুষটিকে দূরে রাখিলে যেন তাহাকে খুঁজিয়া পাইতাম না; সে যেন সারারাত্রি জাগিয়া দূরবীণ কষিয়া দেখিবার মতন অতি দূরের জ্যোতিষ্ক, সে যেন টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিবার পুতুল, সে যেন বুকের উপর বোতাম-বিঁধে সাজাইয়া রাখিবার ফুলটি।

তাহার ছোট হাতখানি আমার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলাম—তখন প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমচিত্র আমার মনে পড়িল। আমি হাসিয়া গাকশার শেখানো পাঠ তাহার কানের কাছে আবৃত্তি করিলাম।

গাকশা বলিয়াছিল সে মন্ত্র। বাস্তবিকই সে মন্ত্র! কিন্তু সে মন্ত্র সয়তানের, সে মন্ত্র সর্ব্বনাশের! আমার কথা শুনিবামাত্র সে আমার হাত হইতে হাত ছিনাইয়া লইয়া বড় রূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া গাকশার শেখানো কথার আরো খানিকটা আবৃত্তি করিলাম।

তখন সে ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণের মতো ছিটকাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘৃণা ভৎ'সনা অবিশ্বাস বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার গাকশার শেখানো পাঠ বলিতে লাগিলাম। তখন চায়া-ওয়া ছুটিয়া গিয়া দোকানের লোকজনদের কি বলিল। অমনি অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া

আমাকে ঘিরিয়া এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যে তাহারা আমাকে মারিয়া দোকান হইতে তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত।

ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, এবং এমন গণ্ডগোল হইয়া উঠিল যে কাহাকেও কোনো কথা বুঝাইয়া বলিবার বা প্রশ্ন করিবার অবসর রহিল না.: এবং দোকানীদের রকম মোটেই না বুঝিবার মতন 'নয় বলিয়া আমি জানা না জানার মধ্যে পড়িয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

এমন সময় দেখি ভিড়ের এক পাশে দাঁড়াইয়া গাকশা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আমি তাহাকে দেখিয়া যেন অকূল সমুদ্রে স্থল পাইলাম। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—গাকৃশা গাকৃশা, চায়া-ওন্না হঠাৎ আমার উপর কেন রাগ করেছে? আমি হয়ত কি বলতে কি বলেছি, কিংবা. ও-ই হয় ত শুনতে কিছু ভুল করেছে; তুমি আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বল গাকৃশা!

গাকৃশা হাসিয়া বলিল—বন্ধু, তুমি কিছুই ভুল বল নি, ওকুসামাও (মহাশয়াও) কিছু ভুল শোনে নি—তুমি তাকে বলেছ, তুই কুৎসিত, তুই আমার দাসী হবারও যোগ্য ন'স, তোকে আমি একটুও ভালোবাসি না, তোকে আমি ঘৃণা করি, শুধু তোকে নিয়ে এতদিন একটু তামাসা কচ্ছিলাম, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া পাংশুল মুখে বলিলাম—সে কি গাকৃশা, আমি তো অমন সব কথা বলতে চাইনি?

গাকৃশা হাসিয়া বলিল—আমি বলাতে চেয়েছিলাম।

আমি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—সে কি গাকৃশা, সে কি? কেন এমন করলে?

গাকৃশা তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল—

ওকুসামা আমার প্রণয়িনী। তুমি নিপ্পন অপবিত্র করবার পূর্ব্বেই আমার হৃদয় ওঁর শ্রীচরণে উৎসর্গ করেছি। হয় না হয় তুমি ওকুসামাকেই জিজ্ঞাসা কর।

একী অদ্ভুত সমস্যা! আমি গাকৃশাকে বলিলাম—গাকৃশা, তুমি ত পরাজিত হয়েছ, এখন ওকুসামা আমার!

গাকৃশা হাসিয়া তেমনি নরম ভাবেই বলিল—ককৃখনো না। যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন না!

এই বলিয়া সে নিজের পেশীপুষ্ট বাহুখানা অনাবৃত করিয়া হাসিতে হাসিতেই আমার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিল।

আমি বলিলাম—ভয় দেখিয়ো না গাকৃশা। তোমার জাপানী যুযুৎসু আছে, আমারও হিন্দুস্থানী কুস্তি আছে। ঠিক বলা যায় না কে জিতবে। অতএব একটা রফা করে ফেল।

গাকৃশা তেমনি হাসিতে হাসিতেই বলিল—হৃদয় নিয়ে যেখানে মারামারি সেখানে আবার রফা কি?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম—গাকৃশা, তুমিই ত নিজে আমায় প্রণয়মন্ত্রে শিক্ষিত করে আমার সফলতার সহায়তা করেছ, এখন এ বিঘ্ন ঘটাচ্ছ কেন?

গাকৃশা হাসিতে হাসিতে বলিল—তখন কি জানতাম যে তুমি আমাকেই আশ্রয় করে আমারই সর্ব্বনাশ করছ? তোমায় এতদিন অনেক কথা শিখিয়েছি। আজ একটা শেষ শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি, বল—জান্নেন নাগারা কোকো দে ও য়াকারে মোশিমাস।

আমি হতাশ ভাবে দুঃখবিমলিন মুখে বলিলাম—গাকৃশা, এর অর্থটাও তবে বলে দাও।

গাকশা তেমনি হাসিয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুঃখিত হইতেছি, আজ এই আমাদের চিরবিদায় !

দেয়ালের আড়াল

সহরের সে এক টেরে, নদীর ধারে, বাদশাহের সেই কয়েদখানা—বিশাল কালো পাষাণময় দেয়াল ঘেরা। নদীর চঞ্চল ঢেউগুলি বাহিরের ব্যথিত হৃদয়ের ব্যাকুলতার মতন দেয়ালের গায়ে আছাড় খায়, চূর্ণ হয়,—পাষাণ প্রাচীর বিশ্বনিখিলের স্নেহবিচ্যুত নরনারীকে আগুলিয়া অটল গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সেই হৃদয়ভাঙা কাণ্ডখানা দেখে।

এটি সাধারণ অপরাধীদের কয়েদখানা নয়—এটি রাজনৈতিক কয়েদখানা। এখানে থাকে তাহারাই নজরবন্দী, যাহারা রাজরোষে অভিশপ্ত, যাহারা যে-সে লোক নয়, যাহাদের আটক রাখায় বাদশাহী স্বার্থ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

কত নিরপরাধী প্রাণ রাজনীতির কূট-চক্রে পড়িয়া গিয়া এখানে আটক আছে। শাদা সেই প্রাণগুলি কালো দেয়ালের আড়ালে, কালো হাবসীর পাহারায়, কালো আঁধারের মাঝখানে, আজকে একা বন্দী। প্রত্যেক লোকের একটি একটি পৃথক ঘর—এক বাড়ীতে থাকে তাহারা এই পর্য্যন্ত, কেহ কাহারো নাম জানে না।

তবু এদের পরস্পরের পরিচয়ের অভাব নাই। দেয়ালের গায়ে আঙুলের টোকা মারিয়া ঘরে ঘরে এদের আলাপ চলে।

আঙুলের টোকার ভিতর দিয়া প্রাণের ভাষা আপনাকে ব্যক্ত করে। এমনি ভাবে কত বন্ধুর সন্ধান মিলে, কত অজানা বন্ধু হয়, কত আলাপ জমিয়া উঠে।

মাঝে মাঝে ঘরের বাহিরের বারান্দায় হাবসী খোজার নাল-বাঁধানো নাগরা জুতোর ঠকাস ঠকাস শব্দ যেই তাহাদের কানে আসে অমনি এই নির্বাক আলাপ থামিয়া যায়,—হাবসী খোজার পায়চারির আওয়াজ আবার যখন দূরে সরে তখন আবার টোকার শব্দে দেয়ালগুলি মুখর হইয়া উঠে।

চোখে না দেখিয়া, কথা না শুনিয়া, তাহারা টোকার আওয়াজে বুঝিত কে কেমন লোক—কাহার প্রাণে কেমন ব্যথা লুকানো আছে, কেবা জ্ঞানী কেবা অবোধ, কে প্রশান্ত কেবা অধীর, কে কোন ভাবের কেমন ভাবুক। টোকার ভিতর দিয়া তাহাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, সান্ত্বনা সহানুভূতি, এসব ভবের আনাগোনা করিত।

এমনি এক ঘরে বন্দী ছিল এক তরুণী। দোষ শুধু তারি রূপ আছে, যৌবন আছে, আর আছে একখানি স্বচ্ছ সবুজ প্রণয়-পাগল প্রাণ। সে অর্থের কাছে প্রণয়কে, বাদশাহী শাসনের কাছে নারীত্বকে খাটো করিতে পারে নাই, তাইতে সে বন্দী! ভীরু পাখীর মতন পিঞ্জরে অসহায় সে বন্দিনী—তবু তার তনুখানি আনন্দ উল্লাসে ডগমগ, প্রাণখানি গীতে হাস্যে ভরপুর!

বেচারী যে দিন প্রথম এই কয়েদখানায় আসে—তাহার মনে হইল এ এক নূতনতর মজা! বাদশাহের সে বন্দিনী—তবে তো সে যে-সে লোক নয়! ভাবিতে ভাবিতে তাহার ভারি হাসি আসিল—সে গলা ছাড়িয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার সেই গানের মতন তরল মধুর হাসিখানি স্তব্ধ কারার ঘরে ঘরে যেন অমৃতবৃষ্টি করিয়া গেল। কয়েদিরা সব চমকিয়া কান খাড়া করিল।

হাবসী খোজার মিস কালো মুখের মাঝে লাল লাল চোখ দুটো এক মালসা কয়লার মাঝে আগুনের দুটো ফুলকির মতন রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে দরজার গায়ে জালির উপর চোখ রাঙাইয়া বলিতে গেল—চোপ রও। কিন্তু সেই আনন্দমূর্ত্তির রূপের নেশায় হাবসী খোজারও ভাবহীন অন্তরে রমণীপ্রভাব সাড়া দিল, কঠিন কুটিল দৃষ্টি তাহার সরল তরল হইয়া পড়িল, চুপ করাইতে গিয়া নিজেই সে চুপ রহিয়া গেল, তাহার কালো পুরু ঠোঁটের উপর সুখাবেশের সরস হাসির রেখা ছাড়া আর কিছু ফুটিল না। আজ এই প্রথম হাবসী শান্ত্রীর কাজের ত্রুটি কিছুতেই আর নিবারণ করা গেল না।

ঘরে ঘরে টোকায় টোকায় প্রশ্ন চলিল—এ কে, এ কে রে? এমন কঠিন জায়গায় এমন মধুর ভুবনভুলানো হাসি হাসে কে রে?

কেহই জানে না—তাহাকে তো কেহই দেখে নাই। এই পর্য্যন্ত তাহারা বুঝিল সে রমণী—আর সে তরুণী! সুন্দরী কি না কে জানে! কয়েদি প্রহরী সকলেই নিজেদের মধ্যে রমণীর মধুসঙ্গ অনুভব করিয়া আনন্দিত হইল।

তাহার কামরার পাশে বন্দী ছিল এক তরুণ। কালো কালো চারখানি দেয়ালের মাঝে তাহার তরুণ জীবনের অনেকগুলি মাস নিরানন্দে নিষ্ফল গেছে—তবু তাহার অন্তরের তারুণ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

যেইমাত্র সেই তরুণীর হাসির ঢেউ তাহার প্রাণের তটে

আঘাত করিল অমনি তাহার সমস্ত প্রাণ বসন্ত-স্পর্শে বিপত্র তরুর মতন আপনার তারুণ্যে পরিপূর্ণ সুন্দর হইয়া উঠিল। বিচিত্র ভাব পুষ্পপুটে সুরভির মতো তাহার প্রাণখানি ভরিয়া তুলিল।

সে অনুভব করিল সেই কঠিন দেয়ালের আড়ালে একখানি কোমল প্রাণের মধুর স্পন্দন; সে শুনিতে পাইল পরীর মতন লঘু তাহার পায়ের ধ্বনি, কবিতার ছন্দের মতন তাহার নিশ্বাস! তরুণ তরুণী পাশাপাশি—মাঝে শুধু ব্যবধান একখানি মাত্র দেয়াল! কিন্তু সে-ই কত দুর্লঙ্ঘ্য!

দেয়ালের গায়ে কান পাতিয়া যুবক শুইয়া পড়িল। তরুণীর ওড়নার স্পন্দন, তাহার ভূষণের শিঞ্জন, তাহার আনন্দের গুঞ্জন, সব শোনা গেল। শুধু দেখা গেল না তাহার রূপ।

সে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল এ তরুণী না জানি কেমন? লতার মতন তন্বী, মূর্চ্ছার মতন মনোহারিণী, ইন্দুলেখার মতন অপরূপ সুন্দরী! তাহার পরনে নীল পেশোয়াজ, রাঙা আঙিয়া, ফিরোজা ওড়না—বুটিদার, চুমকিওলা! স্বচ্ছ লঘু হাওয়ার মতন। তাহার কালো টানা চোখের কোলে সুর্ম্মা আঁকা, পাতার মতন ঠোঁট দুখানি পানের রসে টুকটুকে, চাঁপার গুচ্ছ হাত দুখানি মেহেদি-মাখা! ভ্রূ দুখানি যেন স্বচ্ছ শাদা মেঘের উপর কালো কুচকুচে রামধনু। পিঠের উপর রেশম-কোমল কালো চুলের দীর্ঘ বেণী মুক্তার মালায় বেষ্টিত। মুখখানি তার হাসির মতো, বুকখানি তার ঢেউয়ের ন্যায়। তার হাসি যেন এসরাজের সুর, কথা যেন সেতারের ঝঙ্কার! সে সজীব আনন্দমূর্ত্তি! কয়েদখানার তরুণী সে—তার জীবনখানি না জানি

কি অসীম রহস্যে মাখানো,—সে যেন কোন স্বপ্ন-লোকের কল্পনা!

তরুণ যুবক আস্তে আস্তে দেয়ালের গায়ে আঙুল দিয়া টোকা মারিল। টোকার মধ্যে সে বলিতে চাহিল—ওগো তুমি কে গো? তুমি তরুণী, তুমি সুন্দরী, তুমি একাকী—এ নিঝুম পুরীতে আমার বন্দা-প্রাণের ক্ষুধিত-প্রণয় আমি তোমায় দিব, শুধু তোমায় দিব!

তরুণী সেই টোকার শব্দ শুনিল—কিন্তু সেই নির্বাক ভাষা সে বুঝিল না কিছুই। শুধু এইটুকু সে বুঝিল এই দেয়ালের ওপারে আছে এমন একজন লোক যে তাহার জন্য ভাবিতেছে, যে তাহাকে আপনার করিতে চাহিতেছে, যে তাহার কাছে আলাপ মাগিতেছে। সে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল শুধু টুক টুক টুক। যত শোনে ততই সেই অস্ফুট ভাষা ব্যক্ততর হয়, তাহার কানে তাহা প্রণয়-সঙ্গীতের মতো বাজিতে থাকে। সে কান পাতিয়া শুনিল একখানি উৎসুক হৃদয় তাহারই জন্য ললিতছন্দে স্পন্দিত হইতেছে। সেও তখন তাহার সরমসঙ্কোচ-ভয়ভাবনায় কম্পিত কোমল আঙুল দিয়া দেয়ালের গায়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিল—সে আঘাতে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রণয় বীণার মতো বাজিতে লাগিল। কী যে তার ধ্বনি! কী যে তার অনুরণন!

এমন করিয়া তরুণ দুটি প্রাণ তাহাদের প্রণয়গান দিনের পর দিন জুড়িয়া পরস্পরকে শোনায়।

তরুণী ক্রমে এই আলাপে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে জানিল না দেয়ালপারের তাহার বন্ধুটি তরুণ কি বৃদ্ধ, বিবাহিত কি অবিবাহিত, কেমন কোন অপরাধে সে এখানে আজ বন্দী। শুধু

সে জানিল দেয়ালপারে একপ্রাণ প্রণয় তাহারই অপেক্ষায় আকুলিবিকুলি করিতেছে; সে তাহার বন্ধু! সে তাহার প্রণয়প্রার্থী!

রাতের পর রাত জাগিয়া তাহাদের এমনি অবুঝ আলাপ চলে। কারাগারের বিজনতা এমনি করিয়া সঙ্গ-সোহাগে রসাপ্লুত হয়। দেয়ালের পাশে বসিয়া বসিয়া আঙুলের টোকায় আলাপ করিতে করিতে তরুণী তাহার ক্লান্ত মাথাটি দেয়ালের গায়ে রাখে, সর্বশরীর এলাইয়া দেয়ালে সে ঠেসান দেয়, সেই কঠিন কালো পাষাণ প্রাচীর যেন তাহারই বন্ধুর প্রণয়কোমল বক্ষতট,—ভাবিতে ভাবিতে সুখাবেশে তাহার বিনিদ্র নয়ন মুদিয়া আসে।

এমনিতর পরিপূর্ণ সুখের সময় থাকে থাকে সে আপন মনে উচ্চরবে হাসিয়া উঠে, হৃদয় ছাপাইয়া গান ছুটে, সারা ঘরময় লঘুতালে সে নাচিয়া ফিরে। এই আনন্দের অমৃতপরশ কারাগারের সকল লোকের দুঃখবেদনা যেন মুছিয়া দেয়—হাবসী শাস্ত্রী এমনিতর নিয়মভঙ্গ শাসন করিবার মতন কঠোরতা সঞ্চয় করিতে পারে না।

একদিনকার প্রভাতে একজন কে কয়েদ দরজার জালি দিয়া দেখিল বাহিরের আঙিনায় "কৎল্" করিবার আয়োজন হইতেছে। দেখিয়া তাহার মুখ শুখাইল, বুক কাঁপিল। তখন টোকায় টোকায় এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে সেঘর প্রশ্ন চলিল—কে রে, কে সে হতভাগা যাহার জীবনের অবসান এমনতর আসন্ন?

সবাই নিজেকেই সেই মৃত্যুর নিমন্ত্রিত মনে করিতে লাগিল। সকলেই সঙ্গীদের কাছে বিদায় লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। ক্রমে ক্রমে টোকার শব্দ থামিয়া গেল। সবাই স্তব্ধ—যেন জনপ্রাণী জীবিত নাই, সবাই সেথায় মরিয়াছে।

তরুণীর দেয়ালে আজ তাহার বন্ধুর করাঘাত বড় কম্পিত, বড় ব্যগ্র, বড় গুরু। আগেকার মতন এ চুরিকরা প্রণয়বাণী নয়, আজ যেন এ জীবনমৃত্যুর সমস্যা, প্রাণের সকল কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিবার প্রাণপণ এ চেষ্টা, আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিবার উদগ্র এ আকাঙ্ক্ষা। দেয়ালের গায়ে ঘুসি মারিয়া, লাথি কসিয়া, মাথা ঠুকিয়া পাষাণ প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে সে চায়!

তরুণী কিন্তু বুঝিল না তাহার হৃদয়বন্ধু হৃদয় ভাঙিয়া কি বলিয়া গেল—শুধু সে বুঝিল একটি চুম্বনের শব্দ, একটি বিষাদগভীর দীর্ঘশ্বাস। তারপর সব চুপচাপ।

তরণী ভয়স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল। প্রতীক্ষা করিয়া রহিল আবার তাহার বন্ধু তাহাকে ডাকিবে, আবার তাহার কানে প্রণয়গাথা ঢালিয়া দিবে। কিন্তু বৃথা তাহার আশা, বৃথা তখন প্রতীক্ষা। সমস্ত দিন গেল, রাত্রি ঘনাইল, তবু তো কৈ পাশের ঘরে কোনো সাড়া শব্দ নাই। সে অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া বসিয়া কি যে ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে না।

তখন বাহিরেও সে কী দুর্যোগ! ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্র! ঝড়ের হাহাকার, বৃষ্টির ক্রন্দন, বিদ্যুতের জ্বালা, বজ্রের হুঙ্কার তাহাকে নূতন করিয়া আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে তরুণী চেতনা পাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অন্ধকার ঘরের মাঝখানে সে বসিয়া আছে একা। তাহার এতদিনের সঙ্গীর, তাহার দুঃখদিনের বন্ধুর এখনো কোনো সাড়া নাই। সে ধীরে ধীরে দেয়ালের গায়ে টোকা মারিল। তবু কোনো সাড়া নাই। তাহার বন্ধু যখন তাহাকে ব্যগ্রভাবে ডাকিয়াছিল তখন সে সাড়া দেয় নাই, তাই কি বন্ধু রাগ

করিয়াছে ?" সে সোহাগভরে আবার ডাকিল। নাই নাই—কোনো সাড়া নাই। তখন সে দুঃখে অভিমানে কাতর হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিল, ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম তো কিছুতেই আসিল না। তখন তাহার ভারি একা একা বোধ হইতে লাগিল—এতদিন পরে আজ সে কারাগারে একা বন্দিনী! সে এক-একবার ভাবে আর একবার ডাকি; আবার ভাবে, না, সেই আগে ডাকুক। কিন্তু অভিমান করিয়া আর কতক্ষণ থাকা যায়,—সে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেয়ালময় আঘাত করিয়া ফিরিল—ওগো বন্ধু, কোথায় তুমি, তুমি কোথায়, কোথায় গেলে? বল বল—আর তুমি একটি কথা বল!

সে আনন্দময়ীর করুণক্রন্দন আজ সমস্ত কারাগারকে আবার হঠাৎ চমকিত করিয়া তুলিল। হায় হায়! এমন হাসির প্রতিমাকে কাঁদাইল আজ সে কোন নিষ্ঠুর! সকল কয়েদি চোখ মুছিল। হাবসী খোজার পায়চারিও ভারি মন্থর হইয়া পড়িল।

আনন্দময়ীর কান্নার খবর বাদশাহের কানে গেল। আনন্দিত বাদশাহ তরুণীর ঘরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—সুন্দরী, এইবার বোধ হয় তুমি আমার বশ মানিবে। এতদিন আমার শাসন হাসিয়া হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছ; সুখের খবর, তোমার চোখে আজ জল পড়িয়াছে। বল সুন্দরী, এখন তোমার কোন প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।

তরুণী শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"পাশের ঘরে যে বন্দী ছিল সে কোথায়?"

"সে নাই।"

"সে কোথায় ?"

"জানি না।"

তরুণী ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—"এখন ওঘরে কে আছে ?"

"কেহ না।"

"তবে আমাকে ঐ ঘরে বন্দী করিয়া রাখিতে আজ্ঞা করুন।"

এবার বাদশাহ্ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—"এস।"

তরুণী বাদশাহের অনুসরণ করিয়া পাশের কামরায় গিয়া দেখিল দেয়ালের গায়ে রক্ত দিয়া বড় বড় হরপে লেখা আছে—

আগর মন্ বাজ্ বিনম্ রূ-এ জার্-এ-খেশ্রা।

তা কেয়ামৎ শুক্র্ গুজারম্ কির্দ্দিগার্-এ খেশ্রা।

ওগো আমি যদি আমার প্রতিবেশিনীর মুখখানি একটিবার দেখিতে পাইতাম, তবে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দয়াময় সর্ব্বেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতাম!